Vol. 28 | No. 2 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত ও তাঁর ছোটগল্প

Volume	28
Issue	2
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ভীষ্মদেব চৌধুরী
Published online	February 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v28i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i2.3
Pages	39-104
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত ও তাঁর ছোটগল্প

ভীষ্মদেব চৌধুরী

১

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬—১৯৫৭) তিরিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের উপাদান-বিষয় ও বিন্যাসকুশলতায় বিশিষ্ট যে-মাত্রা যোগ করেছেন, তা যুগপৎ অপূর্ব ও অনন্য। যে জীবন-বীক্ষা 'রূপ ও রসে' তাঁর রচনায় চারুকৃত, তা তাঁর স্বোপার্জিত। গল্প কিম্বা উপন্যাসে পূর্বাপর তিনি সংযুক্ত করেছেন অভিন্ন অভিপ্রায়। উত্তরসামরিক (১৯১৪-১৭) বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব অবাঞ্ছিত নয়; কেননা, এই আবির্ভাবের পটভূমি প্রস্তুত করেছে সময় ও সমাজ। উত্তরসামরিক বিশ্বে যে না-অর্থক সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রতিবেশ আরোপিত হয়েছিল, অবিলম্বে ভারতবর্ষে ঘটেছিল তার সংক্রমণ। রুশ-বিপ্লবের (১৯১৭) হ্যাঁ-অর্থক পরিণাম ভারতবর্ষের জনচিত্তে তাৎক্ষণিক কোন প্রভাব বিস্তার করেনি; ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে স্বশ্রেণী-চ্যুত মুষ্টিমেয় ক'জন বুদ্ধিজীবীর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ব্যতীত রুশ-বিপ্লবের তথা মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রভাব কিম্বা বিস্তার অন্তত দেড়যুগ উত্তরে অনুসন্ধানীয়। যদিও এই সময়-সীমায় 'অগ্নিবীণা'য় সুর তুলেছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), রচিত হ'য়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক ও সমকালীন জীবন-স্পর্শী উপন্যাসসমূহ। তথাপি, বাংলা কথাসাহিত্যের আসরে জগদীশ গুপ্তের আবির্ভাবকাল[১] সামাজিক নৈরাশ্যে পীড়িত। পঙ্ক-বিলাস, ছদ্ম প্রচ্ছদে অনিকেত মানুষ, আত্মবিবরবাসনা, অতৃপ্তির ও অচরিতার্থতার ক্লিন্ন বিকার, রবীন্দ্র-বিরোধিতা সূত্রে বাস্তবতার নির্মোকে রোম্যানটিক ভাবালুতা—অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি-মন অনিবার্যভাবে সময়ের এই অসঙ্গতিতে হয়েছে বিদ্ধ। এ-জগৎ অবিশ্বাসের ও অসঙ্গতির। বাংলা কথাসাহিত্যে জগদীশ গুপ্ত এই অসঙ্গতির রূপকার।

১ ক

নবাগত এই যুগের গুণগত ও মাত্রাগত বৈশিষ্ট্যের যুগ-টীকা ললাটে ধারণ ক'রে 'কল্লোল' (১৩৩০ বঙ্গাব্দ, ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ) পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। এর কিছুকাল পরেই প্রকাশ লাভ করে 'কালি-কলম' (১৩৩৩, ১৯২৬) ও 'প্রগতি' (১৩৩৪, ১৯২৭) পত্রিকা। নবীন মূল্যবোধ ও যুদ্ধোত্তর যুগ-চৈতন্যের ধারক-রূপে 'কল্লোল'-এর বৈপ্লবিক ভূমিকা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোল-যুগ' অভিধায় চিহ্নিত। যদিও এর পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১)-এর জগন্নাথ হলের বার্ষিকী 'বাসন্তিকা'য় (১৯২২) ঐ নব-যুগবৈশিষ্ট্যের বীজ উপ্ত হয়েছে।[২] সিগমন্ড ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ তত্ত্বের প্রচার (১৯১৩), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ-বিপ্লব, অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০), মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় রাজনৈতিক কর্মীর শাস্তি (১৯২৯), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩১), নঞর্থক সন্ত্রাসবাদ, বিশ্ব মুদ্রা-বাজারের মন্দা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আত্মীকৃত ক'রেই সূচিত হয়েছে সাহিত্যের 'কল্লোল-যুগ'। কল্লোল-যুগের সাহিত্য এই অপচয়িত যুগের অপচয়মান মানুষের বিকৃতির, অসঙ্গতির শিল্পরূপ। 'কল্লোল' পত্রিকার সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১), সহ-সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) এই দুই সূত্রধার সহ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩--৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-৬৭) এবং জগদীশচন্দ্র গুপ্ত কল্লোল-যুগের প্রধান কথাসাহিত্যিক। অবশ্য এঁদের মধ্যে গল্পকার হিসেবে জগদীশ গুপ্ত ছিলেন 'কালি-কলম' গোষ্ঠীভুক্ত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন[৩] :

> জগদীশ গুপ্ত কোনোদিন কল্লোল অফিসে আসেন নি। মফঃস্বল শহরে থাকতেন, সেইখানেই থেকেছেন স্বনিষ্ঠায়। লোক কোলাহলের মধ্যে এসে সাফল্যের সার্টিফিকেট খোঁজেননি। সাহিত্যকে ভালেবেসেছেন প্রাণ দিয়ে। প্রাণ দিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। স্বস্থানসংস্থিত একনিষ্ঠ শিল্পকার।
>
> অনেকের কাছেই তিনি অদেখা, হয়তো বা অনুপস্থিত।··· ''কালিকলম''-কে তিনি অফুরন্ত সাহায্য করেছেন গল্প দিয়ে, সেই সম্পর্কে মুরলীদার সঙ্গে তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা জমে ওঠে। যৌবন যে বয়সে নয়, মনের মাধুরীতে, জগদীশ গুপ্ত তার আরেক প্রমাণ।

বস্তুতঃই, জগদীশ গুপ্ত তাঁর সমকালীন সাহিত্যিক-পরিমণ্ডল থেকে দূরে অবস্থান করেছেন। পত্র-পত্রিকা-কেন্দ্রিক আড্ডা বা মজলিশেই শুধু নয়, বাস্তবতার নির্মোকে যে-রোম্যানটিক স্বপ্ন-বিহার পূজ্য ছিল কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের—জগদীশ গুপ্তের রচনায় ছিল তার অনুপস্থিতি। তিনি সমাজ বাস্তবতাজাত ব্যক্তি-অসঙ্গতির কথাকোবিদ—আণুবীক্ষণিক অনুসন্ধানেও তাঁর রচনায় রোম্যানটিক-চেতনা আবিষ্কার অসম্ভব। জগদীশ গুপ্ত জনান্তিকের সাহিত্যিক; তাঁর সম্পর্কে প্রযুক্ত "অনুপস্থিত"[৪] পদবন্ধ তাই সঞ্চার করে বহুমাত্রিক দ্যোতনা। কথাসাহিত্যের জগতে জগদীশগুপ্তের আবির্ভাব বিরোধ-প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত নয়। বুদ্ধদেব বসু কথিত "যাকে 'কল্লোল'-যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে-বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ"[৫]—এ-জাতীয় আরোপিত লক্ষণ জগদীশ-সাহিত্যে দুর্নিরীক্ষ্য।[৬] বরঞ্চ 'কল্লোল'-সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ব্যাখ্যা গ্রহণীয় এবং জগদীশ গুপ্ত-প্রসঙ্গে তা' অধিকতর প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জন্যতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলেকায়"।[৭] গল্পকার-হিসেবে জগদীশ গুপ্তের আত্মপ্রকাশের ইতিহাস নিঃসন্দেহে কৌতুকাবহ,[৮]—কিন্তু সূচনা থেকে যে সংহত অভিপ্রায় তিনি অক্ষুণ্ন রেখেছেন তা'তে প্রতিক্রিয়া স্থান পায়নি—জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর স্বতন্ত্র অণুবীক্ষা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত শিল্পপ্রতিমায় হয়েছে চিত্রিত।

১ খ

আদি ও সমকালীন সমালোচনায় জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যিক—স্বাতন্ত্র্যের সূত্র-নির্দেশের প্রয়াস চলেছে। কার্যত, জগদীশচন্দ্রের পূর্বসুরি নেই; নেই উত্তরসাধক। তিনি অপচয়মান মানবাত্মার বিনষ্টির রূপকার; অন্তর্গত অসঙ্গতির চারুশিল্পী। দার্শনিক প্রজ্ঞায়, বাস্তব-প্রকৃতির অনুধ্যানে, আশা ও নিরাশার দ্বৈধ আবর্তে ঘূর্ণায়মান মানুষকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। দুঃখ তাঁর আরাধ্য, বাস্তবিক বলেই। ফ্রয়েড তাঁর পঠিত, অস্বীকার করতে পারেন না তাই জৈব-বাস্তবতা; প্লেটো তাঁর আয়ত্ত তাই অস্বীকার করেন তিনি "প্লেটোনিক লাভ"। এই-যে দ্বিধা—তা-ই জগদীশ গুপ্তকে করেছে

স্বতন্ত্র। "অনুপস্থিত" জগদীশ গুপ্ত ব্যতিক্রম ব'লেই অনুপস্থিত, স্বল্পপঠিত, জনান্তিক এবং অন্তরালবর্তী। কিন্তু কথাসাহিত্যের আলোচনায় তিনি ব্রাত্য নন; বিশিষ্টতার মাত্রিকতার কারণেই তিনি আলোচিত ব্যক্তিত্ব। বলা বাহুল্য এই তর্কবিতর্কময় আলোচনার প্রতিপাদ্য জগদীশ গুপ্তের জীবনার্থ-সন্ধান।

জগদীশ গুপ্তের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বিনোদিনী' (১৩৩৪) সম্পর্কে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে এটাই জগদীশ-সাহিত্যের আদি-সমালোচনা। ঐ-আলোচনায় বলা হয়:

> এই গ্রন্থে নয়টি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে ডট্ ও ড্যাশের এবং দুই চারি কথার ছোট ছোট প্যারার প্রাচুর্য্য দেখিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল এই গল্পগুলি বুঝি প্রথম-রিপুমূলক অর্থাৎ "অতি আধুনিক" ধরনের হইবে। কিন্তু পড়িয়া আমাদের সে ভ্রম দূর হইল—কোনও গল্পেই লেখক ভদ্রতা ও শালীনতাকে কিছুমাত্র অতিক্রম করেন নাই। অতি-আধুনিক ভাষাপদ্ধতিমাত্র তিনি অনুকরণ করিয়াছেন, তাহার ফলে রচনা অনেক স্থলে জটিল ও আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ভঙ্গি করিয়া কথা বলার মোহ তিনি সম্বরণ করিলে, সহজ সরল ন্যাকামি-বর্জিত ভাষায় লিখিলে, গল্পগুলি অধিকতর উপাদেয় হইত।...
>
> গল্পগুলি পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছে, কথাসাহিত্যে জগদীশবাবু বিশিষ্ট আসন লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অতি-আধুনিকদের বিকৃত ও বিরক্তিকর বাগ্‌ভঙ্গির অনুকরণ বর্জন করা তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন।[৯]

লক্ষণীয়, উপর্যুক্ত আলোচনায় জগদীশ গুপ্তের রচনাকৌশলের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়েছে। যদিও প্রথানুগ সমালোচনায় আস্থাশীল অজ্ঞাত-নাম সমালোচক প্রদান করেছেন নীতিগর্ভ ব্যবস্থাপত্র। কেননা, প্রচলিত সাহিত্যের ধারায় অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রম সাহিত্য-প্রয়াস সহজ লোকগ্রাহ্যতা অর্জন করতে পারে না। অবশ্য জগদীশচন্দ্র 'বিনোদিনী'র রচনারীতি ও জীবনবীক্ষা উত্তরকালের রচনায় অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

অতঃপর জগদীশ গুপ্ত বিষয়ক সমালোচনায় প্রাধান্য অর্জন করেছে তাঁর জীবনার্থ-অনুসন্ধান। প্রবীণ সাহিত্যালোচনা থেকে নবীন সাহিত্যমূল্যায়নেও জগদীশ গুপ্তের জীবনার্থ-জিজ্ঞাসা বর্তমান। প্রধান প্রধান সমালোচকের মূল্যায়ন, আমাদের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে উদ্ধৃত করছি।

অনিলবরণ রায় :

> ···শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার ছোটগল্পে যে ধারা প্রবর্তিত করিয়াছেন, কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোথাও তাহার তুলনা নাই বলিলেই হয়। তিনি philosophy of sex বা কাম-তত্ত্বের বিশেষ ধার ধারেন না। তিনি দেখিতেছেন, ভগবান, ধর্ম্ম, নৈতিকতা এ সবই যে মিথ্যা শুধু তাহাই নহে, এ-সংসারের যে বিধাতা সে এক নির্ম্মম ক্রূর হৃদয় সয়তান।···
>
> ইহাই জগদীশচন্দ্রের জগৎ! এখানে মানুষ, জড়প্রকৃতি, প্রেতাত্মা সকলেই মানুষের মর্ম্ম ছিঁড়িবার জন্য ব্যস্ত এবং এই সবের অন্তরালে থাকিয়া একজন নিয়ন্তা—তাহাকে সয়তানই বলা যায়—মানুষের এই মর্ম্মবেদনায় আনন্দলাভ করিতেছে।···
>
> প্রাচীন গ্রীসদেশীয় tragedy-তে নিয়তির (Doom, necessity, Ate) খেলা বর্ণিত হইয়াছে, জগদীশচন্দ্রের সয়তানী শক্তির সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে। ঐ অদৃষ্ট বা নিয়তি যেন ওত্ পাতিয়া বসিয়া আছে, কোথাও একটু ফাঁক পাইলেই মানুষকে আক্রমণ করিবে। সে-শক্তি মানুষের ভোগের, সুখের, উন্নতির শত্রু।···মানুষ নিজের কর্ম্মফলেই নিজের উপর নিয়তির নির্ম্মম আঘাত ডাকিয়া আনে। কিন্তু, জগদীশচন্দ্রের মধ্যে এরূপ কোনও নিয়ম নাই।···[১০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

> ছোটগল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।[১১]

মোহিতলাল মজুমদার :

মানুষের জীবনে একটা অতিশয় দয়াহীন ও দুর্জ্ঞেয় দৈব-নির্য্যাতনের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে ; মনে হয়, জীবনের আলোকোজ্জ্বল নাট্য-শালার এক প্রান্তে একটা অন্ধকারময় কোণ আছে, সেখানে একটা নামহীন আকারহীন হিংস্রতা সর্বক্ষণ ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে—মানুষ তাহারই যেন এক অসহায় শিকার ; তাহার নিষ্ঠুরতাও তত ভয়ঙ্কর নয় —যত ভয়ঙ্কর তাহার সেই অতি-প্রাকৃত রূপ। যাহাকে আদিম মানবের কুসংস্কার অথবা বিকারগ্রস্ত রোগীর দুঃস্বপ্ন বলা যায়—সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের সুস্থ বুদ্ধি যে সকল ঘটনাকে কল্পনারও বিরোধী বলিয়া মনে করে, জগদীশচন্দ্র তেমন ঘটনাকেও তাঁহার গল্পে—শুধু সম্ভাব্যতা নয়—এমন বাস্তবতায় মণ্ডিত করিয়াছেন যে, ইংরাজীতে যাহাকে bizarre বলে, সেই ভাব আমাদিগকে অভিভূত করে।[১২]

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ :

জগদীশ শরৎচন্দ্রেরই গোত্রজ, তাঁরই প্রতিভার মানসপুত্র। এই বস্তুতন্ত্র সংসারের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, কামনা-বাসনার পাঁকে মধু-গন্ধ-সুরভিতে অনুপম পদ্ম ফুটিয়ে তোলবার শিল্পী এঁরা। আকাশের আলো যে ধরিত্রীরই অন্ধকারের গর্ভজাত সন্তান, সত্য ও সুন্দর যে মিথ্যা ও অসুন্দরের স্বকে ঢাকা সুমিষ্ট অমৃত-ফল, তা এঁরাই মনোজ্ঞ করে মানুষকে দেখিয়েছেন। এই সুন্দরের জগতে পাপ-পুণ্য নাই, আছে জগৎস্রষ্টার অভিনব নব নব রস আর বিচিত্র ভিয়ান।[১৩]

সুকুমার সেন :

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) শৈলজানন্দের মতোই জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী এবং ইঁহার গল্পেও প্রকৃতিকতাই (ডক্টর সেন রিয়ালিজ্‌ম্-এর পরিভাষা-রূপে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন) পরিস্ফুট।...জগদীশচন্দ্রের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কাহিনীর কঠোর দুঃখময়তায় এবং রচনারীতির বিদ্রূপ-ইঙ্গিতপূর্ণ সংক্ষিপ্ত স্পষ্টতায়। অসহায় মানুষের জীবনচক্র ঘুরিতেছে নির্মম নিষ্ঠুর হিংস্র অদৃষ্টের হাতে—ইহাই জগদীশচন্দ্রের গল্পের অমোঘ নির্দেশ। মানুষের দৈন্য-কুশ্রীতা-নোংরামীর জন্য

জগদীশচন্দ্র সমসাময়িক "আধুনিক" লেখকদের মতো সমাজের বা ব্যক্তির ঔদাসীন্য, ঘৃণা বা লুব্ধতা দায়ী বলিয়া দেখান নাই,...তিনি কিছুকে ও কাহাকে হেতুভূত না করিয়া যে হিংস্র অন্ধ অদৃষ্ট শক্তি মানুষের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলে তাহার দিকে ইশারা করিয়াছেন।[১৪]

অশোক গুহ :

'''মৃত্যুর কিছু পূর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুর পর তাঁর নাম মানিক-প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে উল্লেখিত হতে দেখা গেল।'''

'''গঁকুর যে অর্থে জোলার মন্ত্রগুরু জগদীশচন্দ্রও বোধহয় তাই। জগদীশ গুপ্ত প্রথম ঐ-খাতে ভাবতে শুরু করেছিলেন বলেই তাঁকে পহেলা সম্মান আমরা দিতে পারি, কিন্তু মন্ত্রগুরু আখ্যা তাঁকে দেয়া চলে না। বস্তু-তান্ত্রিকতার কলমের দুজন লেখক—জগদীশ আর মানিক।[১৫]

সুবীর রায়চৌধুরী :

'''জগদীশ গুপ্তর পাত্র-পাত্রীদের হৃদয় বা মস্তিষ্ক (sic) যতোটুকু না থাকলে নয়, ততোটুকুই আছে। তাদের অস্তিত্ব একান্তভাবে দেহ-সর্বস্ব। আদিম জৈববৃত্তির তাড়নায় ও আগ্রহে তারা বেঁচে থাকে ব'লে সুনীতি-কুনীতি, পাপ-পুন্য, বিবেক ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। সমাজ যে বদলানো যায় বা যেতে পারে এ-আস্থা জগদীশ গুপ্তর বিশেষ ছিলো না। তবে সমাজে শোষক-শোষিতের ভূমিকা বিষয়ে তিনি সচেতন। কিন্তু অবস্থাভেদে সব মানুষই শোষক কিংবা শোষিত।'''

জগদীশ গুপ্তর জগতে মানুষ শুধু নির্মম নয়, নিয়তিও কুচক্রী, অনেক ক্ষেত্রে নিয়তির আবির্ভাব হয়তো কাকতালীয় (যেমন, 'হাড়', 'দিবসের শেষে')। মোটের উপর মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রতিহিংসার।'''

'''জগদীশ গুপ্তর রচনায় ফ্রয়েডীয় অবচেতন তত্ত্বের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়, কিন্তু সেটা নরেশচন্দ্রের মতো সচেতন ভাবে আমদানী করা নয়। অন্যদিকে জগদীশ গুপ্ত, প্রভাতকুমারের মতো 'ক্ষমাসুন্দর চক্ষে'ও

পৃথিবীকে দেখেন নি। বস্তুত প্রভাতকুমারের থেকে জগদীশ গুপ্তর জগৎ একেবারে আলাদা। তিনি আগাগোড়া তিক্ত, রুক্ষ এবং নৈরাশ্য-বাদী।[১৬]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় :

···মানুষ তার কর্মফলকে মুছে ফেলে স্বাধীন শুদ্ধতাভিসারী হতে চায়। উত্তম, নটবর, কিশোরী—এরা সকলেই তাঁর এই বক্তব্যের প্রমাণ। অনন্ত প্রয়াসশীল মানুষের যন্ত্রণাকে, পরাভবকে যিনি এঁকেছেন তিনি মানুষকে ছোট করে আঁকেননি। জগদীশ গুপ্ত সম্বন্ধে এইটাই প্রধান কথা।[১৭]

অশ্রুকুমার সিকদার :

ইউরোপে পোস্ট রেনেসাঁস অ-মানবতন্ত্রী সাহিত্যের পত্তন হয়তো ডস্টয়েভস্কি এবং বোদলেয়ারের রচনায়। এই অ-মানবতন্ত্রী সাহিত্য ঐতিহ্যবিরোধী, অসামাজিক ; তার জগৎ হতাশাময় অন্ধকারে বদ্ধমূল, পচনশীলতা আর বন্ধ্যাত্ব তার স্বধর্ম। বিষমিষা ও নির্বেদ সেই জগৎকে আচ্ছন্ন করেছে। তার পথপ্রান্তর অসুস্থ, মানসিকভাবে পঙ্গু-মানুষে আকীর্ণ। মানুষ সেখানে নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, প্রবাসী।···

···পোস্ট-রেনেসাঁস অ-মানবতন্ত্রী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য যাঁর রচনায় সবচেয়ে বেশি প্রকট তিনি 'অনুপস্থিত' লেখক জগদীশচন্দ্র গুপ্ত।···

···কলুষবাহিনীর আক্রমণে বিপর্যস্ত পর্যুদস্ত হয়ে, জগদীশ গুপ্ত দেখান, বারবার পরাভূত পবিত্রতা ও শুচিতাকে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে একলা গিয়ে দাঁড়াতে হয়। তার কোনো উপায় দেখেন নি জগদীশ গুপ্ত, কারণ এক ভয়ঙ্কর হতাশাময় পোস্ট-রেনেসাঁস আধুনিক দৃষ্টি দিয়ে তিনি জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। মানুষের সংসারে তিনি দেখেছিলেন নৃশংস অ-মানবিকতা, মনুষ্যত্বহীনতা।[১৮]

উপর্যুক্ত পঙক্তিগুচ্ছ যদিও মূল সমালোচনার খণ্ড-রূপ, তবু নির্দ্বিধায় বলা চলে যে উদ্ধৃতাংশসমূহ অবিচ্ছিন্ন আলোচনার চুম্বক ; আলোচকদের বক্তব্য ও জিজ্ঞাসালব্ধ প্রত্যয়ের সারাংসার। দর্শনীয় যে, প্রায়-সব আলোচকই

হয়েছেন স্ববিরোধ-আক্রান্ত, যার অনিবার্য পরিণাম পরস্পর-বিরোধিতা। অনিলবরণ রায় জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যের নিয়ন্তা হিসেবে "নির্মম ক্রূর হৃদয় সয়তান"—বিধাতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এই 'অদৃষ্ট' বা 'নিয়তি'র সঙ্গে গ্রীক ট্র্যাজেডির নিয়তির তুলনা করেছেন, অথচ পূর্বেই উল্লেখ করেছেন "কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচীন কি আধুনিক কোথাও তাহার তুলনা নাই"। মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), ভূদেব চৌধুরী[১৯], অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়[২০] প্রমুখ সমালোচক অনিলবরণ রায় উত্থাপিত গুপ্ত-সাহিত্যের নিয়তি বা অদৃষ্টবাদী তত্ত্বের সমর্থক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জগদীশ গুপ্তের গল্পে 'রূপ ও রসে'র পরিস্ফুটনে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং 'লঘু-গুরু' উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ-উপন্যাসে নিষিদ্ধ লোকযাত্রার রূপায়ণে নিজের অসহিষ্ণু মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তবে, রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র মাত্রা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে 'লঘু-গুরু'র বিষয়-বিন্যাস অংশতঃ বাস্তবপ্রবণ। জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই লক্ষণ-নির্দেশ উত্তরকালের সমালোচনায়[২১] গৃহীত হয়েছে। বারীন্দ্রকুমার ঘোষও জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যের রিয়ালিস্টিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও তাঁর ধারণায় এ-বাস্তবতা শরৎচন্দ্রীয়। এজন্যেই তিনি তাঁকে অভিহিত করেন শরৎচন্দ্রের গোত্রজাত এবং শরৎ-প্রতিভার মানস-সন্তান রূপে। সুকুমার সেন তাঁর বক্তব্যে সন্ধান করেছেন জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে বাস্তববাদ, নিয়তিবাদ ও দুঃখবাদের সমন্বয়। সুবীর রায়চৌধুরী নিয়তিবাদের সঙ্গে যোগ করেছেন ভিন্ন দুই লক্ষণ —নৈরাশ্যবাদ ও দেহবাদ। জগদীশচন্দ্রের চরিত্রসমূহের দেহবাদী বক্তব্য ও আচরণের উৎসে সিগমন্ড ফ্রয়েডের প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। অশোক গুহ'র মতে—ন্যাচারালিজ্‌ম্‌-ই জগদীশ গুপ্তের আরাধ্য এবং ফরাসী সাহিত্যে গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় যে-অর্থে এমিল জোলা (১৮৪০—১৯০২)-র মন্ত্রগুরু, বাংলা সাহিত্যে তেমনি ন্যাচারালিস্ট সাহিত্যরীতির প্রবর্তনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-৫৬) পূর্বসুরি-রূপে জগদীশ গুপ্তের নাম স্মরণীয়। অশ্রুকুমার সিকদার-এর আলোচনা আধুনিকতম; তিনি পোস্ট-রেনেসাঁস ইউরোপীয় অ-মানবতন্ত্রী সাহিত্য-ধারার সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যের সমন্বয় বিচার করেছেন। তাঁর মতে জগদীশ গুপ্তের জগৎ "বিষমিষা ও নির্বেদ"-এ আচ্ছন্ন, তাঁর নরনারী "নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, প্রবাসী" এবং সেখানে "নৃশংস

অমানবিকতা, মনুষ্যত্বহীনতা''ই সত্য। যদিও তিনি 'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৩৩৬, ১৯২৯) উপন্যাসের নটবর চরিত্রের মর্মান্তিক পরিণাম সম্পর্কে তার ''অতীত ইতরতার নিয়তির কাছে'' ''নিরতিশয় পরাভবে''র কথা স্বীকার করেছেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় অপ্রতিহত নিয়তির ভূমিকা উল্লেখ ক'রেও বলেছেন জগদীশ গুপ্তের রচনায় মানুষ, মানবত্ব তুচ্ছতায় চিত্রিত নয়। অশ্রুকুমার সিকদার-এর অ-মানবতন্ত্রী সাহিত্যের ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের ব্যবধান বিস্তর।

জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যসমগ্র সম্পর্কে আপাতবিরোধময় এই সব ভিন্ন ভিন্ন মাত্রানির্দেশনা আংশিক সত্য। আমাদের মূল গল্প-বিষয়ক আলোচনায় এবং গল্প ও উপন্যাসের প্রতি-নির্দেশে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ আমরা প্রত্যক্ষ করব। তবু একটা কথা বলা আবশ্যক যে, বাস্তববাদ ও অদৃষ্ট-বাদের সহাবস্থান কি একই সাহিত্যিকের জীবনবীক্ষায় সম্ভব? যিনি বাস্তব-তার অনুগামী, তাঁর কাছে কীভাবে স্বীকৃত হয় জগৎ ও জীবনের নিয়ন্তা অনির্দেশ্য নিয়তি? শরৎচন্দ্রের বহির্বাস্তবতার এবং জগদীশচন্দ্রের বহির্বাস্ত-বতা এবং অন্তর্বাস্তবতার রসায়ন কখনোই অভিন্ন লক্ষণযুক্ত নয়। জোলার ন্যাচারালিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ—তাঁর চরিত্র ও সমাজ কার্য-কারণের গ্রন্থিতে আবদ্ধ। পরিবেশবিজ্ঞান, বংশগতিবিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ সমন্বিত হ'য়ে সংগঠিত হয়েছিল জোলার সমাজবিপ্লবী শিল্পীচিত্ত। স্তাঁদাল (১৭৮৩-১৮৪২) ও গুস্তাফ ফ্লবেয়ার-এর (১৮২১—৮০) 'মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা', বালজাকের 'অভিব্যক্তিবাদ'—অতি-প্রাকৃত আবহে সন্দিগ্ধ নয়, বিজ্ঞানশুদ্ধ। জোলার শ্রেষ্ঠ রচনা 'জারমিনাল' (১৮৮৮)—এ সমাজবাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর মানবতন্ত্রী মনোভাব। পক্ষান্তরে জগদীশ গুপ্তের জগৎ ও মানুষ অদৃষ্টের প্রতি অন্ধবিশ্বাসে অবাস্তব, আবার জীবন্ত মানুষের মানবিক সম্পর্কের বিশ্বাসহীনতায় বাস্তব। বাস্তবতা ও অবাস্তবতার এই অন্তর্বয়ন জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যসমগ্রের প্রধান লক্ষণ। বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদী দৃষ্টি-ভঙ্গির রূপায়ণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসুরি-রূপে জগদীশ গুপ্তকে করা হয়েছে চিহ্নিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের সাহিত্যের (১৯৩৫-৪৭) সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যের সাদৃশ্যসন্ধান অবান্তর নয়।

কেননা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের উপন্যাসে নিয়তিবাদ, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদের প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ক্রমবিকাশে ব্যাপ্ত—বিজ্ঞানবুদ্ধি তাঁকে উত্তরকালে করেছে প্রসারিত। পক্ষান্তরে, জগদীশ গুপ্ত অভিন্ন অভিপ্রায়ে আমৃত্যু থেকেছেন সুস্থির।

কাজেই এ-প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক যে, কোন্ চেতনান্তর জগদীশ গুপ্তের শিল্পীচিত্ত-কে এই স্ব-বিরোধিতায় অভিষিক্ত করল। অদৃষ্টবাদই জগদীশ গুপ্তের জীবনার্থ—এরকম সরল প্রত্যয়ীকরণ তাই অগ্রহণযোগ্য। জগদীশ গুপ্ত অদৃষ্টবাদী মানুষের বিশ্বাস, জীবনে অদৃষ্টের আধিপত্য এবং বৈনাশিক ক্রূরতায় অদৃশ্য আবির্ভাবের চিত্র অঙ্কন করেছেন; কিন্তু চেতনায় তিনি অদৃষ্টবাদী সিদ্ধান্তের এমন সরলীকরণ তাঁর সমগ্র-রচনার আভ্যন্তর সাক্ষ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। তিনি বাস্তবতায় বিশ্বাসী—কিন্তু যে-জীবনচিত্র তাঁর রচনায় উপস্থাপিত সে-জগতের নিরবলম্ব, অনিকেত, নিরন্ন মানুষ অসহায় ব'লেই অদৃষ্টে বিশ্বাসী। এই অদৃষ্টবাদী মানুষের জীবনাচারের যথা-যথ শিল্পরূপায়ণ বাস্তবতা-পরিপন্থী নয়। জগদীশ গুপ্তের নর-নারী দেশ-কাল ও সমাজকাঠামোর অসঙ্গতিজাত বাস্তবতার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, নৈরাশ্যে আতঙ্কিত এবং পরিণামে অদৃষ্টে সমর্পিত। অতি-আধুনিক বুর্জোয়া-বিশ্বে অদৃষ্টবাদের অনিবার্য পরিণাম যেমন ফ্যাসীবাদ—তেমনি স্বল্পবুদ্ধি, গ্রাম্য, অচ্ছুৎ, স্থূল-রুচির মানুষ একক, নিঃসঙ্গ এবং রাজনৈতিক বোধি-শূন্য ব'লেই স্বাধিকারপ্রমত্ত—অর্থালিপ্সায়, মানবাত্মার অমর্যাদায় এবং দৈহিক কামনা-বাসনায় তামসী-পঙ্কে তাদের নিরুপায় গুহাবাস। আবার শিক্ষিত অথচ সমাজবিচ্ছিন্ন চরিত্রের কেউ কেউ ফ্রয়েডের অনুরাগী তাত্ত্বিক[২২] এবং প্লেটোর দর্শন ও ডিকেন্সের উপন্যাসের সমঝদার।[২৩] এ-কথা সত্য, জগদীশ গুপ্তের সৃষ্ট অধিকাংশ চরিত্রই মানবতা-সুপ্ত লম্পট, জৈবকামনারাক্ষস, অর্থগৃধ্নু পিশাচ এবং সামাজিক-পারিবারিক-মানবিক সম্পর্ক-শৃঙ্খলার বিনাশী-সয়তান। জগদীশ গুপ্ত এই অসঙ্গত কদর্যতার বাস্তবকে শিল্পরূপ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সমগ্র সাহিত্য-বিচারে কখনোই প্রমাণিত হয় না যে তাঁর বোধি মানবতা-বিরোধী। কাজেই অশ্রুকুমার সিকদার-কথিত অ-মানবতন্ত্রী সাহিত্যের পুরোধা-রূপে জগদীশ গুপ্তকে নির্বিচারে আমরা গ্রহণ করতে পারিনা। মানবত্ব তাঁর রচনায় লাঞ্ছিত হয়েছে, হয়েছে বিপর্যস্ত; কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়নি। নিয়তি-

তাড়িত টুকরি ('লঘু-গুরু') ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসনে, জন্মান্ধ, ভ্রষ্টজন্ম নটবর ('অসাধু সিদ্ধার্থ')—যার পাপ অভিশপ্ত বংশগতিযুক্ত—তার মনুষ্যসাধনা কিম্বা রাণু'র ("অরূপের রাস") প্রথম পর্যায়ের অন্তর্গত নীরব প্রণয়াভিসার, নিঃসন্তান রক্ষা'র ("হাড়") বাৎসল্য, পারিবারিক অর্থলিপ্সার পরিণামে কাশী'র ("চার পয়সায় এক আনা") নিরাসক্তি, স্বামীর গোপন কলঙ্কিত জীবনের উন্মোচনে মাখনে'র ("কলঙ্কিত সম্পর্ক") আত্মমর্যাদালব্ধ ঘৃণা, অন্নাভাবগ্রস্ত গুরু'র ("অন্নদার অভিশাপে") আয়াসজাত নবজন্ম, নারী-হরণের ষড়যন্ত্র-সূত্রে অর্জুন নমঃশূদ্রে'র ("প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী") মানবিক দায়িত্ব-বোধক আবির্ভাব, ইত্যাদি ঘটনায় এবং চরিত্রায়ণে পঙ্ক—অসঙ্গতির জীবন ও জগতে পুষ্পিত হয়েছে মানবিক-পঙ্কজ।

২

জগদীশচন্দ্র গুপ্তের সম্পূর্ণ জীবন-বৃত্ত এখনো রচিত হয়নি। তাঁর সুদীর্ঘ একাত্তুর বছরের জীবৎকালের যে-সব তথ্য এ-পর্যন্ত গ্রথিত[২৪] হয়েছে, তা'তে একজন কথাসাহিত্যিকের জীবন ও শিল্পে পরস্পরিত উপাদান-নির্ণয় অসাধ্য। বলা বাহুল্য, দেশকালের পরিপ্রেক্ষণীতে বিস্তারিত ও বিকশিত হয় যে শিল্পী জীবন, সৃষ্টিতে তার অভিব্যক্তি কিম্বা প্রতিফলন অনিবার্য। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে গল্পগ্রন্থ 'মেঘাবৃত অশনি' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) ও 'স্ব-নির্বাচিত গল্প' (১৯৫৯), উপন্যাস 'কলঙ্কিত তীর্থ'[২৫] (১৩৬৭) এবং উপন্যাস ও তার নাট্য-রূপ 'নিষেধের পটভূমিকা' (১৩৫৯) এবং অ-গ্রন্থিত কিছু গল্প ব্যতীত জগদীশ গুপ্তের প্রধান প্রধান রচনা দুই বিশ্বসমরের মধ্যবর্তী সময়-সংলগ্ন। লক্ষণীয়, দুই বিশ্বসমরের মধ্যবর্তী কালের অস্বভাবী প্রতিবেশ-জাত পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া রচনাবলীর ঘটনায় এবং চরিত্রায়ণে বিধৃত। তাঁর সম্পূর্ণ জীবন-বৃত্তের অপ্রাপ্তি-হেতু আমরা জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যালোচনা-মূলক প্রবন্ধ, পত্রাবলী ও কথাসাহিত্য থেকে তাঁর সমাজ-সাহিত্য-ভাবনা ও বিশ্বাসের ভিত্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হব।

২ ক

প্রাপ্ত তথ্যানুসারে 'কল্লোল' পত্রিকার ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)-এর গল্প-প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর

সমালোচনার [প্রভাতকুমারের গল্পগুলি "কালের নিকষমণিতে কতদিন পর্যন্ত টিঁকিতে পারিবে তাহা অনুমান করা শক্ত"।] প্রত্যুত্তরে ঐ-বছরেই 'কালি-কলম' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় জগদীশ গুপ্ত প্রভাতকুমারের সাহিত্য-বিষয়ে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন সেটাই তাঁর প্রথম সাহিত্যালোচনামূলক প্রবন্ধ। এ-প্রবন্ধে লিখিত "নরনারীর যৌন সমস্যা" প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে তাঁর স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টি উদ্ভাসিত :

> নরনারীর যৌনসমস্যা যে স্বল্পক্ষেত্রেও এত জটিল এবং পাত্র-পাত্রীর দৈহিক সম্পর্ক যে এত ঘনিষ্ঠ ও বিবাহনিরপেক্ষ তাহা ভুল করে দিলে প্রভাতবাবু কল্পলোকে ফুটিতে দেখেন নাই, অথবা দেখিলেও দেখান আবশ্যক মনে করেন নাই। ঐ অপরাধে যদি তাঁহাকে বাংলার সাহিত্য রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবার প্রস্তাব কেহ করিয়া থাকেন তবে সাহিত্যের প্রতিই নিদারুণ অবিচার করা হইবে। ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করেন না যে, "সুখপাঠ্য" রচনা সাহিত্যে সুলভ এবং অবহেলার জিনিস নহে।—
>
> . . .
>
> বসু মহাশয়ের লেখনী অক্ষয় হউক, কিন্তু প্রভাতবাবুর গল্পগুলিকে ভুলিবার কথা তিনি যেন আর না বলেন।[২৬]

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত আলোচনায় নরনারীর যৌনসমস্যার জটিলতা ও দৈহিক-সম্পর্কের বিবাহনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাব ইতঃপূর্বে প্রকাশিত গল্পে এবং উত্তরকালের গল্প-উপন্যাসে প্রতিফলিত হতে দেখি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে যে-বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি বুদ্ধদেব বসুকে করেছিল ক্ষুব্ধ, জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে সে-বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে করেছে অসহিষ্ণু। রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণু সমালোচনার (দ্র. তথ্য-নির্দেশ -১১) উত্তেজনাপ্রসূত প্রত্যুত্তরে জগদীশ গুপ্ত 'উদয়-লেখা' (১৩৩৯) গল্প-গ্রন্থের "নিবেদন" অংশে নিষিদ্ধ-পল্লীর অবৈধ-জীবনাচারের সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিজীবনের সমন্বয়-সাধন-প্রয়াসের নিন্দা করেছেন।[২৭] শিল্পী-পাঠক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট (দ্র. তথ্যনির্দেশ-৪)। গল্পের বিষয়-নির্বাচনে জগদীশ গুপ্ত সংস্কার মুক্ত উদার ; মানুষের উন্মুখ প্রবৃত্তি, সুখ-

দুঃখ, বর্তমান ও ভূত-জগতের হাসি-কান্না, ভোগ-লালসা, সঙ্গতি-অসঙ্গতি তাঁর রচনায় শিল্পসুষমায় চিত্রিত। এ-সব বিষয়ে জগদীশ গুপ্তের অকপট উচ্চারণ :

(ক) ···পরকীয়া যতই royal হোক, বস্তিকে যতই আলোড়িত করিয়া তাহার ক্লেশমোচনের চেষ্টা হোক, পতিব্রতার আত্মমর্যাদা ও একনিষ্ঠার সম্ভাবনা যতই লিখিত হোক এবং নির্যাতিতা যতই নির্যাতিতা হোক—সবই মানুষের ঐ চিরন্তন সুখ-দুঃখের কথা। তাই যদি হয়, তবে ভূত জগৎ হইতে আগত সুখ-দুঃখের কথাটাই বা বলিব না কেন।···২৮

(খ) বুদ্ধদেব বসু মহাশয় কল্লোলে লিখিয়াছেন যে বাংলাদেশে কবির উৎপত্তি এবং উন্নতি যতটা সহজ, বিষয়বস্তুর অভাবেই গল্প-লেখকের ততটা উন্নতি দূরে থাক্, গতিই সহজ নহে। শুধু, গল্প লিখিবার বিষয়সৃষ্টির জন্যই তিনি সামাজিক ব্যবস্থা উলটাইয়া দিতে চান।

কিন্তু, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয়, শুধুমাত্র সামাজিক বা সাংসারিক ঘটনা লইয়া গল্প লিখিবার রেওয়াজ যখন ছিল, তখন একথা বলা চলিত। কিন্তু, এখন সে কায়দা ত' নাই ··· উন্মুখ প্রবৃত্তি লইয়াই এবং মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়াই এখন গল্প লেখা চলিতে হইয়াছে। কাজেই মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তির সঙ্গে যার যত পরিচয়, বা সে বিষয়ে যার যত অন্তর্দৃষ্টি, তার গল্প তত বিচিত্র হইবে।···২৯

জগদীশ গুপ্ত গল্পের প্রকরণ-কৌশলে নিরীক্ষাপ্রবণ এবং সংশোধন-প্রিয়৩০; 'কালি-কলম' সম্পাদক মুরলীধর বসু-কে লিখিত পত্রগুচ্ছে৩১ তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। ছোটগল্পের সংগঠন ও শিল্পগুণ এবং অনুবাদ-প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্তের মন্তব্য, আমাদের অবহিত করে। তাঁর শিল্পবোধ সম্পর্কে উদ্ধৃত পঙক্তিগুচ্ছ দ্রষ্টব্য :

(ক) অনেকগুলি শব্দের ব্যবহার করিয়াছি, যাহাতে আপনাদের আপত্তি আছে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু, সবগুলিকে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। যে সমাজের গল্প, সেই সমাজের atmosphere-টা গল্পে অবতীর্ণ হয় ঐরূপ কথার প্রয়োগের দ্বারাই—ইহাই আমার ধারণা, ধারণা ভুল কি না জানি না। যাহা হউক, দেখিয়া শুনিয়া লইবেন।৩২

(খ) ···আমার মনে হয়, ছোটগল্পের ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, চরিত্রের বৈচিত্র্য ফোটানো এক হিসাবে বড় কঠিন কথা ; অর্থাৎ যে অল্প বিস্তারের সীমায় আবদ্ধ করিয়া ছোটগল্পের ঘটনাকে বা চরিত্রগত ভিত্তিকে খাড়া করিতে হইবে, তাহার উপর চরিত্র-বৈচিত্র্যের একটু ইঙ্গিতই আমার পক্ষে সম্ভব, এবং তাহাই এতদিন হইয়া আসিয়াছে।—সুতরাং, ঘটনাটাই প্রবল হইয়া গোচরে আসিয়াছে, চরিত্র চোখে পড়ে নাই।—আর এক কথা, কথাসাহিত্যে কথাকে প্রাধান্য না দিয়া, শুধু তাহাকে চরিত্র ফুটাইবার অবলম্বনরূপে ব্যবহার করিলে সে ক্ষুণ্ণ হয়, অর্থাৎ কথা আর কথা থাকে না, বক্তৃতায় দাঁড়াইয়া যায়।···৩৩

(গ) বিদেশী উপন্যাস, নাটক, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি বড় বড় রচনার অনুবাদ সরাসরি হওয়াই উচিত। কিন্তু, বিদেশী চুটকি লেখার, অর্থাৎ ছোটগল্প, কবিতা, প্রহসনের কেন্দ্রগত ভাবটিকে গ্রহণ করিয়া তার শিল্পী-অবয়বে শিল্পী-রস ঢালিয়া দেওয়া মন্দ নহে। তাহাতে লেখকের সৃষ্টির উল্লাসটা অব্যাহত থাকে, কৃত্রিমতা আসিতে পায় না। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষুদ্র রচনাকে সমগ্রভাবে ওলট্‌পালট্ করিয়া তাহার বিদেশী রংটা মুছিয়া যদি শিল্পী-আকারে গড়িয়া তোলা যায়—শিল্পীর শিল্পপ্রচেষ্টা তাহাতে গতিশীল সতেজ হইয়া শক্তির একটা পরিচয় পায়। কিন্তু সরাসরি অনুবাদে এটা ঘটে বলিয়া মনে হয় না।৩৪

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশে ব্যক্ত হয়েছে জগদীশ গুপ্তের সমাজনিষ্ঠ ভাষাবোধ, প্লট-প্রধান গল্পের আয়তন, বিষয়গুরুত্ব ও চরিত্রের ভূমিকা-প্রসঙ্গ এবং বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদে দেশীয় আবহ নির্মাণের শৈল্পিক যুক্তি। জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্প বিশ্লেষণে আমরা প্রত্যক্ষ করব তাঁর এই শিল্পবোধের পারম্পর্য ও প্রতিফলন। বস্তুতঃ জগদীশচন্দ্র তাঁর প্লট-প্রধান ছোটগল্পের কাহিনী-বিন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন ঘটনাকে ; চরিত্রসমূহ স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়েও ঘটনাতাড়িত ক্রীড়নক মাত্র।

ইতঃপূর্বে, আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, জগদীশ গুপ্তের জীবনার্থ-সন্ধানে তাঁকে দুঃখবাদী, অদৃষ্টবাদী, বাস্তববাদী, অ-মানবতন্ত্রী ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত

করা হয়েছে। এবং প্রসঙ্গক্রমে আমরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছি যে, এ-সব প্রবণতাসমূহ তাঁর রচনায় অল্পাধিক বিদ্যমান। কিন্তু বিভিন্ন প্রবণতার আকস্মিক বা প্রাসঙ্গিক স্ফুরণ যুগপৎভাবে একজন কথাসাহিত্যিকের জীবনার্থের উৎসারণ হতে পারে না। বিশেষতঃ উপাদানসমূহ যদি হয় পরস্পর-বিপরীত। এতদ্ভিন্ন, আমরা আরো লক্ষ্য করেছি, জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে এই প্রবণতাসমূহ পূর্বাপর নিয়োজমান; ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশ-ব্যাখ্যা ও পরিণামে স্ফূর্তি পেয়েছে মন-অভিপ্রায়। ফলতঃ, জগদীশ গুপ্তের বিশ্বাসের ভিত্তি সন্ধান ও তার সার্বজনীন প্রতিষ্ঠা দুঃসাধ্য। এবং নিঃসন্দেহে এটি আধুনিক সাহিত্যসমালোচনার প্রত্যয়-বিরোধী। তবু, জগদীশ গুপ্তের স্ব-অভিমত এবং তাঁর রচনাসমূহের প্রতি-নির্দেশনার সাহায্যে আমাদের পূর্ব-উল্লেখিত অভিমতের যৌক্তিক ভিত্তি প্রমাণে সচেষ্ট হব।

জগদীশ গুপ্তের বেশ ক'টি গল্পের ঘটনা ও চরিত্র অদৃষ্ট-তাড়িত। যদিও এ-সব গল্পের তত্ত্বভূমি জগদীশ গুপ্তের জীবনার্থ-সম্পৃক্ত—এমন প্রমাণে প্রতিষ্ঠ নয়। বিভিন্ন সমালোচক তাঁর উপন্যাসের চরিত্রসমূহের বিকাশ ও বিনাশে আবিষ্কার করেছেন অপ্রতিহত নিয়তির আজ্ঞা। কিন্তু তাঁরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাজাত চরিত্রসমূহের বিকার ও অনিবার্য স্খলনের প্রসঙ্গটি করেননি বিবেচনাভুক্ত। কয়েকটি গল্পে অনির্দেশ্য শক্তির একনায়োকচিত ভূমিকা আছে সত্য,—যেখানে ঘটনার কার্যকারণ বিপর্যস্ত, অবশ্যম্ভাবী প্রলয়ের অশনি-সংকেতে মানুষ শঙ্কা ও ত্রাসবিদ্ধ। এ-ধরনের গল্পে গল্পকার মনুষ্য-জীবনে নিয়তির প্রলয়ঙ্কর আবির্ভাবের স্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং অধিকাংশ গল্পে তিনি বিন্যাস করেছেন স্বাধীকারপ্রমত্ত অথচ কর্ম-অক্ষম, নিঃসঙ্গ, অভাবজাত অর্থলিপ্সু, কামুক-মানুষের অদৃষ্টে-সমর্পিত জীবনের ইতিহাস। তবে, জগদীশ গুপ্ত কোন অবস্থাতেই চরিত্রসমূহের সমাজবাস্তবিক অবস্থানকে অস্বীকৃতি জানাননি। তাঁর চরিত্রসমূহ আর্থিক-সামাজিক অবস্থানজাত বিকারে বিধ্বস্ত—যার অনিবার্য প্রতিফল অদৃষ্টে আস্থা। জগদীশ গুপ্তের স্ব-অভিমত অনুধাবনীয় :

> ···স্বামীর স্মৃতিকে ধ্যান করিয়া উপায়ন্তর অভাবেই ভয়ঙ্কর অদৃষ্টের হাতে পরাভূত আত্মাকে সমর্পণ করা ছাড়া যোগমায়ার চরিত্রের লোকের পক্ষে অপর কিছু সম্ভব নহে। —"অরক্ষণীয়া"র গোনি

> অন্যরকম হইলে অনেক কিছু করিতে পারিত, কিন্তু কেবলি বশ্যতা-স্বীকার করা ছাড়া আর কিছু সে করে নাই। এ-ও তেম্‌নি। —এবং তাহার অদৃষ্টের tragedy-ই ঐ। —বিবাহিত প্রণয়ের সফলতা উহার দ্বারা দেখানো চলিবে না।[৩৫]

বিপন্ন-মানুষের অদৃষ্ট-নির্ভরতার চিত্র জগদীশ গুপ্তের গল্পে সুলভ ; আবার তাঁরই গল্পে এমন ঘটনাও বর্ণিত হতে দেখি—যেখানে বিশেষ চরিত্র নিবেদিত-বশ্যতায় কোন ঘটনার সংঘটনকে 'দৈব' বা 'অদৃষ্ট' ব'লে আক্ষেপ করে, অনুচ্ছেদ-অন্তরে ঐ-ঘটনার সারবত্তাহীনতা অন্য কোন চরিত্রের কার্য-কারণশৃঙ্খলিত মন্তব্যে বা আচরণে প্রমাণিত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, তাঁর সব চরিত্রই অদৃষ্টে আস্থাশীল নয় ; বিশেষ ঘটনাকে যে-চরিত্র অদৃষ্টের অভিশাপ ব'লে মান্য করে, অন্য-চরিত্র অভিন্ন-ঘটনায় পোষণ করে ভিন্ন মত। নিয়তি বা দৈব যে মনুষ্যজীবনের একমাত্র নিয়ামক নয়, জীবন-যাপন, 'ভবিষ্যৎ গঠন' এবং 'ভাগ্যব্যবস্থাপনের ক্ষমতা'-যে মানুষও সংরক্ষণ করে এমন মনোভাবও জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে দুর্লক্ষ্য নয়। 'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ'[৩৬] উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শশধর-এর জন্মপরবর্তী ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে সর্বজ্ঞ-প্রেক্ষণবিন্দু থেকে ঔপন্যাসিকের মন্তব্য :

> কতদিনের আয়ু লইয়া পুত্র জন্মগ্রহণ করিল তাহা যখন অনুমান করা যায় না, তেম্‌নি অনুমান করা যায় না যে, এই জাতক উত্তরকালে ভীরু হইবে কি বীর হইবে, মূর্খ হইবে কি বিদ্বান হইবে, দরিদ্র হইবে কি ধনী হইবে। ভবিষ্যৎটা সমগ্রভাবে অন্তরালে থাকায়, এবং কোনো দিকে ছিদ্র নাই বলিয়া তার ছায়া সম্মুখে না আসায়, অসন্তোষজনক এই অসুবিধাটা ঘটে। তবু যদি বলা যায় যে, ভবিষ্যৎ গঠনের এবং ভাগ্য ব্যবস্থাপনের ক্ষমতা, দৈব ব্যতীত, মানুষের হাতেও খানিকটা আছে তবে ভুল বলা হইবে না।...[৩৭]

জগদীশ গুপ্তকে দুঃখবাদী ঔপন্যাসিক-রূপে অভিহিত ক'রে কবি যতীন্দ্র-নাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭-১৯৫৪) দুঃখবাদের সঙ্গে তাঁর জীবনদর্শনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ের চেষ্টাও কেউ কেউ করেছেন। জগদীশ গুপ্তের গল্প-উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র সর্বদাই দুঃখের মুখোমুখি ; এই দুঃখ কখনো

অদৃষ্টাগত, কখনো শ্রেণীঅবস্থান-উত্থিত, আবার কখনো কার্যকারণসূত্র-গ্রথিত চরিত্র-বিচ্যুতি থেকে অঙ্কুরিত। তবে, জগদীশ গুপ্ত নৈরাশ্যের রূপদর্শী হলেও, নৈরাশ্যবিহারী নন; তাঁর কবিসত্তার অকপট উচ্চারণ :

দুঃখ কষ্ট এ জীবনে চিরস্থায়ী নয়,
আজ হ'ক, কাল হ'ক, হবে তার ক্ষয়।
তবু সেই ভাগ্যবান, যার যথাকালে,
দুঃখ অন্তে সুখোদয় সম্ভবে কপালে।
আমি নয় সেই দলে তাতে নাই ক্ষতি
অশ্রুর কমলে পূজি দুঃখ-সরস্বতী।[৩৮]

জগদীশ গুপ্তের গল্প-উপন্যাসের নরনারীর মধ্যে এমন অনেক চরিত্র আছে, যারা গৃহহীন, অনিকেত; কেউ বা সামাজিক অবস্থানগত কারণেই পথিক, আবার কেউ গৃহী হয়েও গৃহ-স্থিত নয়, অপাঙ্‌ক্তেয়। লক্ষ্য করার বিষয় জগদীশ গুপ্ত নিজেও এক-পর্যায়ে ছিলেন উদ্বাস্তু[৩৯]; তবু, সমালোচনার 'ভ্রূকুটি' উপেক্ষা ক'রে সাহিত্যে স্ব-আদর্শের রূপায়ণে[৪০] তিনি যেমন ছিলেন সুস্থির, সম্ভবতঃ যাপিত-জীবনেও ছিল তাঁর সেই হতাশামুক্ত দৃঢ়তা। ব্যক্তিজীবনে আর্থিক টানাপোড়েনের ইতিহাসের কিঞ্চিৎ মুদ্রিত হয়ে আছে তাঁর পত্রাবলীতে। অর্থসঙ্কট তাঁকে হতাশা-গহ্বরে নিক্ষেপ করেনি; জাগ্রত করেছে কর্মস্পৃহা—কালি-উৎপাদন-প্রচেষ্টা[৪১] তারই ইঙ্গিতবহ। এবং একইসঙ্গে সাহিত্যিকও যে পেশাজীবী, তাঁর জীবনের নিয়ামক যে অর্থ বা মুদ্রা—এ-ধারণা ব্যক্ত হতে দেখি একখানা পত্রে :

> দীনেশবাবু এক পত্র লিখিয়াছেন, এখন খুব সাবধানে লিখিবেন, এবং 'কল্লোলে'র জন্য ভাল একটা গল্প চাই।—কিন্তু জিনিষ যতই ভাল হোক, তাহার যদি Commercial value না থাকে, তবে needy লোক সে বস্তু উৎপন্ন করিতে চাহিবে না। প্রেরণা, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কথা ঋণদায়গ্রস্তকে বেশী সান্ত্বনা দিতে পারে না বলিয়াই মনে হয়।—সাহিত্য-সেবা ত স্বর্গীয় বস্তু, তাতে শক্তিমানের অধিকার।[৪২]

জগদীশ গুপ্তের জীবনে অর্থের প্রয়োজন ছিল; বিভিন্ন পেশায় স্থানান্তরিত হয়েও তিনি সাহিত্যিক-পেশাজীবী। জীবনে অর্থের ভূমিকার অভিজ্ঞতা

নিজ-জীবনসূত্রে তিনি অর্জন করেছেন। তাঁর সৃষ্ট অনেক চরিত্রের মধ্যে আমরা দেখি নির্বিকার অর্থলিপ্সা——মানবতা-বিধ্বংসী নগ্নরূপে যার আবির্ভাব। সুবীর রায়চৌধুরী জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে লিখেছেন: "সমাজ যে বদলানো যায় বা যেতে পারে এ-আস্থা জগদীশ গুপ্তর ছিলো না। তবে সমাজে শোষক-শোষিতের ভূমিকা বিষয়ে তিনি সচেতন। কিন্তু অবস্থাভেদে সব মানুষই শোষক কিংবা শোষিত।" জগদীশ গুপ্তের গল্প-উপন্যাস ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে তিনি যে-জগৎ থেকে ঘটনা ও চরিত্র গ্রহণ করেছেন, সে-জগতের মানুষ শোষিত-সম্প্রদায়েরই ভগ্নাংশ। এবং এ-জগতের মানুষ সুসংগঠিত নয়; পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ আত্মগুহাবাসী। জন্মেই এরা অন্ধ; অদৃষ্টে সমর্পিত ব'লেই লালসা ও ভোগের পঙ্ক-বিহারে স্বাধিকার-প্রমত্ত, মানবতা-সুপ্ত রক্তমাংসের মানুষ। জন্মের অভিশাপে অসুস্থ প্রতিবেশে এদের অনিবার্য আবাস, ফলতঃ, সুস্থ জীবনের প্রত্যাশায় যখনই এরা হয়েছে উদ্যোগী——প্রথাবদ্ধ সমাজের মূল্যবোধ ও অনুশাসন তাদের পুনর্নিক্ষেপ করেছে জন্ম-ভূমে। সুবীর রায়চৌধুরী-কথিত সমাজ বদলানোর প্রসঙ্গ বাস্তবিক হ'লেও জগদীশচন্দ্র-সৃষ্ট চরিত্রের পক্ষে সমাজবিপ্লব অসম্ভব। তবে, শোষণের সার্বজনীন ধর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত। একটি লঘু-রসের গল্পে অপ-নায়ক পঞ্চানন মশার রক্তশোষণ সম্পর্কে যে-অনুভূতি প্রকাশ করেছে তাতে শোষণের মারণান্তিক রূপ ও ধর্ম সম্পর্কে গল্পকারের মনোভাব অভিব্যক্ত। উদ্ধৃতি লক্ষণীয়:

> ···যাহারা রক্তশোষণ করে তাহারা আন্দোলনে বিচলিত হয় না এটা আধিভৌতিক, বৈজ্ঞানিক সত্য——
> রক্তশোষণের ধর্মই ঐ।[৪৩]

কাজেই এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না যে পরিবর্তমান যে-জীবন তাঁর কথাসাহিত্যে শিল্পরূপ পেয়েছে, সে-পরিবর্তনের কার্যকারণ-সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন। তাঁর সৃষ্ট জগৎ ও জীবন রূপান্তরিত ও ক্রমবিকশিত সমাজ-কাঠামোরই একটি পর্যায়, যা ভাঙনের, ধ্বংসের, অবক্ষয়ের, বিকৃতির, অসঙ্গতির। এই অপচয়মান যুগের অসঙ্গতিগুচ্ছের তিনি যে চলচ্চিত্রায়ণ করেছেন, সে-জগৎ নিয়তিচালিত অভিশপ্ত ইডিপাসের জীবনের মত বিশৃঙ্খল নয়, যেখানে শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তাই, জগদীশ গুপ্ত নৈরাশ্যবাদী,

অদৃষ্টবাদী মানুষের রূপকার কিম্বা বাংলা সাহিত্যে অ-মানবতন্ত্রী চেতনার উদ্‌গাতা—অভিধার এমন সরলীকরণে আমাদের অনাস্থা। অশোক গুহ তাঁর প্রবন্ধে[৪৪] জগদীশ গুপ্তের শেষ জীবনের রচনা "আগমন ও প্রত্যাবর্তন"-এর কিয়দংশ উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি তথা সাম্যবাদের মূল সূত্র "বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিত"-এ ঝলকিত হয়েও অসমাপ্ত :

> মানুষের মুক্তি এবং আপেক্ষিক মূল্য সম্বন্ধীয় কি একটা বাদ যেন ইহার নাম—মাথায় যারা বড় তাদের ভূমিসাৎ করিয়া সম-অবস্থায় আনাই সেই বাদের লক্ষ্য। সেই বাদ অর্থাৎ, দুর্গত, উপেক্ষিত, বঞ্চিত মানবাত্মার আজিকার লক্ষ্য আমি···?

৩

জগদীশ গুপ্তের রচনায় বিধৃত প্রবণতা-নির্দেশ প্রসঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, অনির্দেশ্য অদৃষ্টের ভূমিকা এবং বাস্তবপ্রবণতা, দুঃখ, অর্থলিপ্সা ও স্বাধিকারপ্রমত্ত মানুষের যৌনতৃষ্ণা—জগৎ ও জীবনের এই সঙ্গতি-অসঙ্গতি-সমূহ যুগপৎভাবে তাঁর রচনায় বিরাজমান। তাঁর কিছু গল্প কার্যকারণসম্পর্ক-রহিত, বিজ্ঞানলুপ্ত এবং ব্যাখ্যা-নিরপেক্ষ; পরিণামে বিমূঢ়-বিপন্ন-বিস্ময়ে পাঠকক্ষে ত্রাস-শঙ্কাহত আবেশে হতে হয় বিবশ। গল্পের রূপকার্থ-সন্ধান বা আবিষ্কারই এই বিবশ-মুক্তির একমাত্র পথ। এতদ্ব্যতীত, আমরা এ-ও লক্ষ্য করেছি যে,—কার্যকারণসম্পর্কযুক্ত কিছু গল্পে অদৃষ্টবাদী মানুষের বিশ্বাস, বিকৃতি-অসঙ্গতি রূপলাভ করেছে। এ-সব প্রবণতার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রাপ্ত রচনা অবলম্বনে আমরা তাঁর গল্পের শ্রেণীকরণ করেছি। বলা বাহুল্য, রচনার দুষ্প্রাপ্যতাহেতু তাঁর সমগ্র-গল্পের একটি খণ্ডাংশ এই শ্রেণী-বিভাজনের উপজীব্য।[৪৫] শ্রেণীকরণকৃত গল্পগুলি হ'ল (ক) কার্য-কারণ-বিশৃঙ্খল অদৃষ্টচালিত গল্প : "দিবসের শেষে", "হাড়" (খ) সামাজিক অসঙ্গতিমূলক গল্প : "পল্লী-শ্মশান", "পুরাতন ভৃত্য", "প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী", "—পয়োমুখম্", "কলঙ্কিত সম্পর্ক", "চন্দ্র-সূর্য যতোদিন", "আদি কথার একটি", "শঙ্কিতা অভয়া", "তরঙ্গ হইতে তরঙ্গে", "বেলোয়ারী টোপ", "মারে কেষ্ট রাখে কে!" (গ) প্রেমের গল্প : 'অরূপের রাস", "আশা

এবং আমি", "শশাঙ্ক ঋষিরাজের স্ত্রী", "অপহৃত আকাশ-কুসুম" (ব) শ্রেণী-উত্থান এবং অর্থের ভূমিকা ভিত্তিক গল্প : "পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক", "গুরুদয়ালের অপরাধ", "সুলভ মৃত্যু", "চার পয়সায় এক আনা", "অনুদার অভিশাপে", "রাণী শান্তমণি", "এইখার লোকে ঠিক বলে", (ঙ) অতি-প্রাকৃত গল্প : "তৃষিত আত্মা", "দৈব ধন" (চ) লঘুরসের গল্প : "আঠারো কলার একটি", "জগন্নাথের যন্ত্রণা", "জ্বরশনির গ্রহশুদ্ধি", "কামাখ্যার কর্মদোষে—", "জ্যাঠানন্দ", "পেয়িং গেস্ট", "ব্যস্তবাগীশ", "অধ্রুবম্ নষ্টমেব হি" (ছ) বিচ্ছিন্নতার ইঙ্গিতবহ গল্প : "ভরা সুখে"।

৩ ক

"দিবসের শেষে" এবং "হাড়"[৪৬] গল্প দু'টিতে সংঘটিত ঘটনা নিয়তি-চালিত এবং অমোঘ ; মানুষের দিব্যদৃষ্টিজাত অনুমান ও অভিশাপ সেখানে শঙ্কা ও ত্রাসবিদ্ধ। আমাদের সংগৃহীত গল্পসমূহের মধ্যে এ-দু'টি গল্প বিষয়গত কারণে ব্যতিক্রম এবং অনন্য। কেননা এতে কার্যকারণ-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত, যুক্তিপরম্পরা তিরোহিত এবং নিয়তিশাসিত মানুষ অদৃষ্টের অমোঘ নির্দেশে পরাজিত। অতি-প্রাকৃত গল্প দু'টি ব্যতীত, কার্যকারণ-বিশৃঙ্খলা জগদীশ গুপ্তের অন্যান্য গল্পে দুর্নিরীক্ষ্য। একজন রিয়ালিস্ট সাহিত্যিকের রচনায় জীবনের এই অস্বাভাবিক প্রকাশ বিস্ময়কর ব'লেই এর কারণ অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়। আমরা পূর্বে বলেছি যে, জগদীশ গুপ্ত নিজে রিয়ালিস্ট ব'লেই অদৃষ্টবাদী মানুষের জীবনযাত্রা বাস্তবানুগ অণুবীক্ষায় শিল্প-রূপ দিয়েছেন। কিন্তু উল্লিখিত গল্প দুটিতে অতিলৌকিক অদৃশ্য যে-শক্তির বিজয় ঘোষিত হল, জগদীশ গুপ্তের বিশ্বাস-ভিত্তির সঙ্গে তাকে একীভূত করা যায় না।

"দিবসের শেষে" গল্পটির সূচনায় সর্বজ্ঞ প্রেক্ষণবিন্দু থেকে গল্পকার "বস্তুতান্ত্রিক" রতি-নাপিতের বাড়ির অবস্থান, তার সামাজিক ভিত্তি, পারি-বারিক জীবন, এবং তার জীবন-দৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়ে ক্রমশঃ আখ্যানকে কেন্দ্র-গামী করেছেন। রতি-নারানী দম্পতির তিনটি পুত্র প্রসবগৃহ থেকে নদীবক্ষে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর "পাঁচু গোপালের মাদুলী" ধারণ করার বদৌলতে

পাঁচুর জন্ম। "বহু আরাধনার ধন" পাঁচ বছরের পাঁচু এক সকালে সহসা যে-বাক্য উচ্চারণ করে তা "যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি অবিশ্বাস্য":

···নারানী তাহাকে হাত ধরিয়া খেতের দিকে লইয়া যাইতেছিল——নিঃশব্দে যাইতে-যাইতে পাঁচু মায়ের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, মা, আজ আমায় কুমীরে নেবে।

নারানী চমকিয়া উঠিয়া বলিল,——সে কি রে?

——হ্যাঁ, মা, আজ আমায় কুমীরে নেবে।

——কি ক'রে জানলি।

পাঁচু বলিল,——তা জানিনে।[৪৭]

ছেলের এই অস্বাভাবী-সংলাপে নারানীর চিত্তে জাগ্রত শঙ্কা ক্রমশঃ সংক্রামিত হ'য়ে পাঠক হৃদয়-কে করে ত্রাসবিদ্ধ। দুপুরে রতি-নাপিত পুত্রকে কামদা নদীতে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে আনে। 'কামদা'——সুপ্তগর্ভ অর্থ যার নামেই অভিব্যঞ্জিত--পূর্বাহ্নে সর্বজ্ঞ-গল্পকার তার বর্ণনা দিয়েছেন, এ ভাবে:

তখন আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগ——নদী বাড়িয়া চড়া ডুবাইয়া জল খাড়া পাড়ের মৃত্তিকা ছল্ ছল্ শব্দে লেহন করিতেছে; স্বচ্ছ শান্ত জল পঙ্কিল ও খরগতি হইয়া উঠিয়াছে; তবু ভয়ের কোনো কারণ নাই। এই নদী, কামদা, তার দুইতীর, আর তার জল তাহাদের চিরপরিচিত; এ নদী ত' নরঘাতিনী রাক্ষসী নহে, স্তন্যদায়িনী জননীর মত মমতাময়ী——চিরদিন সে গিরিগৃহের স্নেহের শীতল নীর তাদের পল্লী-কুটিরের দুয়ার পর্যন্ত বহিয়া আনিয়া দিতেছে। তাকে ভয় নাই।[৪৮]

কিন্তু মধ্যাহ্নে পাঁচু-সমেত স্নান করতে এসে আশঙ্কাগ্রস্ত রতির প্রেক্ষণবিন্দুতে কামদার ভিন্ন রূপ:

জলের ধার পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া রতি থমকিয়া দাঁড়াইল——তার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে মধ্যাহ্নরৌদ্রে শাণিত অস্ত্রের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে।··· দুর্লঙ্ঘ্য তীব্র স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে——এতবড় একটা গতিবেগ, অথচ তার শব্দ নাই, অবয়ব নাই, ভাল করিয়া সে যেন চোখে পড়ে না; যেন গঙ্গাধরের সমস্ত দুঃশাসিত নির্মম শক্তি এই

নিঃশব্দ গম্ভীর গতির অনির্দেশ্য বহিরবয়ব ব্যাপিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে। —এমন নিদারুণ নিষ্করুণ রূপ লইয়া এই প্রিয় নদীটি আর কোনোদিন তার চোখে পড়ে নাই। ইহার বাহিরটাই আজ এমন ভয়াবহ, না জানি ইহার দুর্নিরীক্ষ্য অতল গর্ভে কত হিংসা দংষ্ট্রা মেলিয়া ফিরিতেছে!···রতি শিহরিয়া উঠিল। শঙ্কিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে সম্মুখে দক্ষিণে ও বামে বহুদূর পর্যন্ত চাহিয়া দেখিল—নদীর নিষ্কম্পবক্ষে একটি বুদ্বুদও কোথাও নাই।···৪৯

তথাপি, নিরাপদে স্নান-সমাপন ক'রে উভয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু অপরাহ্নে—'দিবসের শেষে' ঘটনার অনিবার্যতায় পাঁচুকে নিয়ে পুনরায় রতিকে কামদায় আসতে হয়। চুরি ক'রে কাঁঠাল খাওয়ার পরিণামে "কাঁঠালের গাঢ় রসে সর্বদেহ আপ্লুত" হওয়ার পাঁচুর পুনরায় স্নান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ঘটি হাতে পাঁচু রতির সঙ্গে নদীতে যায়, এবং স্নান-শেষে ভ্রমবশতঃ ঘটিটা জলের ধারে রেখে আসে। ফলতঃ পাঁচুর কার্যকারণ-হীন পূর্ব-সংলাপের বাস্তবায়ন হয়ে ওঠে অনিবার্য—শান্তশ্রী কামদার সুপ্ত-গর্ভ লেলিহ-কামনা ক্ষুধা-রাক্ষসের প্রলয়ঙ্কর মূর্তিতে আবির্ভূত হয়:

···খানিকটা দূর উঠিয়া আসিয়া পাঁচু হঠাৎ থামিয়া বলিয়া উঠিল,—বাবা আমার ঘট ?

উভয়েই ফিরিয়া দেখিল, জলের ধারেই ঘট পড়িয়া আছে।

পাঁচু আকুল হইয়া বলিল,—নিয়ে আসি, বাবা ?

রতি বলিল,—যা।

পাঁচু হেঁট হইয়া ঘট তুলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় তাহারই একান্ত সন্নিকটে দু'টি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিল; পরমুহূর্তেই সে স্থানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিল, লেজটা একবার চমক দিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া গেল—এবং চক্ষের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

···মুদ্রিতচক্ষু আড়ষ্টজিহ্ব ভয়ার্ত রতির স্তম্ভিত বিমূঢ় ভাবটা কাটিতে বেশী সময় লাগিল না—পরক্ষণেই তাহার মুহুর্মুহুঃ তীব্র আর্তনাদে দেখিতে দেখিতে নদীতীর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল।···

যখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্বার দেখা গেল তখন সে কুম্ভীরের মুখে, নিশ্চল।··· জনতা হায় হায় করিয়া উঠিল, পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিল···সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।··· কেবল পাঁচুর মা সে দৃশ্য দেখিল না।···সে তখন মূর্চ্ছিতা।—৫০

লক্ষণীয়, গল্পকারের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ-জাত মধ্যাহ্নের নদী-রূপ-বর্ণনায় জগদীশ গুপ্তের চিত্র-উপমাজগৎ ও বাক্-ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের নদী-রূপ-তুল্য। অধিকাংশ সমালোচক গল্পটির আখ্যান-বৈশিষ্ট্যের চমৎকারিত্বে বিস্ময়-বিমূঢ়তাসূচক[৫১] মন্তব্য করেছেন; সংগঠন-কৌশলের অন্তর্নিহিত সূত্র এবং আখ্যানের কার্যকারণবিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে কোন বক্তব্য রাখেন নি। এ-কথা সত্য, পাঁচ বছর বয়সের একটি শিশুর আত্মবিনাশের অযৌক্তিক কৌতূহল-উদ্দীপক সংলাপ-সূত্রে ক্রম-আশঙ্কার ত্রাস-সংক্রামক আখ্যান বিন্যাস ক'রে এবং আখ্যানের পরিণামে কার্যকারণবিযুক্ত দৈব-বাস্তবতার অপ্রতিহত সংহারক আবির্ভাবে গল্পকার যে রূপরঞ্জিত শিল্প নির্মাণ করেছেন সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তা' অনুপম, তুলনারহিত। তবু, একটি জিজ্ঞাসা অবশিষ্ট থেকে যায়—"কামদায় কুমির? ইহা অপেক্ষা হাস্যকর উক্তি আর কী হইতে পারে!" কিম্বা "···কামদায় কুমির ভাসিতে এ-গ্রামের কেহ কখনো দেখে নাই, এমন কি সুদূরের জনশ্রুতি আসিয়াও এ-গ্রামের কানে কখনো পৌঁছায় নাই" এমন প্রত্যয়নিষ্ঠ উচ্চারণের বিপরীতে কামদায় কুমিরের আবির্ভাব কি সম্ভব? জানি, দৈববাদ ব্যাকরণবিমুখ, বিজ্ঞান-লুপ্ত এবং আদি-কারণে সুস্থিত। তথাপি, প্রশ্ন জাগে—পটভূমি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তমান সমাজের যে-চিত্রাবলী জগদীশ গুপ্ত অঙ্কন করেছেন, পারিবারিক অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছিন্নতার যে-ইঙ্গিত "ভরা সুখে"[৫২] গল্পে সঞ্চারিত—সে-ই ইঙ্গিত কি "দিবসের শেষে"র রূপকার্থে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন গল্পকার? প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নবকৌশলের সঙ্গে, মুদ্রা-রাক্ষস আর শ্রমরাক্ষসের অনন্ত-ক্ষুধা আর তার লোলুপিত বিশাল মুখগহ্বরের অসীম কামনার সঙ্গে—শান্তশ্রী কামদায় কুমিরের আকস্মিক আবির্ভাব, জীবন-হরণ, ত্রাসসঞ্চার কি রূপকার্থ সমন্বিত?

"হাড়" গল্পেও বিপর্যস্ত হয়েছে কার্যকারণ; প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অদৃষ্টবাদী মানুষের বিশ্বাস, লোকাচার ও সংস্কার। জগদীশ গুপ্তের নিজের ভাষায়

"হাড়" গল্পের "অনাড়ম্বরতাই উহার সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং উহাই তাহার সৌন্দর্য"[৩]। বস্তুতঃ এ-গল্পেও সঞ্চার করা হয়েছে শঙ্কা ও ত্রাস ; যদিও গল্পের চরিত্রসমূহ যতটা না আশঙ্কাতাড়িত, পাঠকুল তার চাইতে বেশী ত্রাস-আহত। এবং এই আশঙ্কা ও ত্রাসের সূত্রপাত গল্পের মধ্যপর্যায় থেকে—"দিবসের শেষে"র মতই নিয়তির অন্বভাবী আবির্ভাবে তার সমাপ্তি।

গল্পের বিষয়টি চয়ন করা হয়েছে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের নিম্নতর পর্যায় থেকে। রাক্ষা দাসীর মৃত্যুর আইনানুগ সাজা নেই ; বিষ-মিশ্রণে বা ছুরিকাঘাতে তার মৃত্যু হয়নি—"তবু এটা হত্যাই"। এমন ইঙ্গিতময় বাক্‌রীতিতে গল্পের আরম্ভ—গল্পকার অনুচ্ছেদ-অন্তরে অবশ্য সংবাদ পরিবেষণ করেছেন—"রক্ষার স্বামী সনাতন লোক ভালো নয়।" রক্ষা সন্তানহীনা রসি-নাম্নি এক বৃদ্ধাকে মাসি সম্বোধন করত। মৃত্যুর পূর্বে রক্ষা তার একমাত্র সন্তান মথুর-এর লালন-পালন প্রসঙ্গে এই কথা উচ্চারণ করে যে, "মাসি, দেখো মথুরকে ; যেন বাপের মতো না হয়।" রক্ষার মৃত্যুর পর রসি মাতৃহীন মথুর-এর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করলে সনাতন "...রসির সম্মুখেই তাহার স্বার্থ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ে এমন সব অন্যায় কথা বলিয়া গেল যে যার ওজন লাঠির চেয়ে ঢের বেশি। ...শেষে বলিল, মাগি, ডাইনি।" রসির বাৎসল্য-জাগ্রত মাতৃহৃদয় হল আপমানিত। গ্রামে এমন ধারণা প্রচলিত ছিল যে, "রসি 'মন্ত্রতন্ত্র গুণজ্ঞান' জানে", তাকে "ঘাঁটানো দুঃসাহসের কাজ, বিপদ সঙ্কুল তো বটেই"—

> ওলা দেবী কি মা শীতলা তো যখন-তখন দেখা দিতে পারেন।... তার শান্তি-স্বস্ত্যয়ন নাই, শাস্ত্রের সজীব মন্ত্র একেবারে নিরুপায় ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবাক্য একেবারে নিষ্ফল, রক্ষাকালীও সরিয়া দাঁড়ান।
>
> ইহাদের উপর যদি পুং-শকুনের বিষ্ঠা আর স্ত্রী-ভেকের লালা পাওয়া যায় তবে তো—
>
> কাজেই রসিকে সনাতন অপমান করিয়াছে শুনিয়া গ্রামের লোক কাঁপিয়া উঠিল—
>
> না জানি কী ঘটে।[৪]

পক্ষান্তরে, বাৎসল্য-রস জাগ্রত রসির মাতৃহৃদয়ে অপমান-সংযোগে প্রজ্বলিত হয়েছে আগুন, তবু মাতৃত্বের অনুপম অনুভূতি আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষাই তার মধ্যে সুস্থির থেকেছে :

> রসির একান্ত ইচ্ছা, মরা মানুষের কথাটা রাখে। অপমান হইয়াও সে নিরস্ত হইতে চাহে নাই। এবার সে মনের ইচ্ছাটা মানুষের মুখে গুঁজিয়া দিলো।···ইহজন্মে রসিকে (sic) কেহ মা বলিয়া ডাকে নাই ···কেহ ডাকিবে এ আশাও নাই···তবু একটি কচি প্রাণ, প্রথমে নির্লিপ্ত—
>
> তারপরে ধীরে ধীরে বেড়িয়া ধরিবে—
> এ যে বড়ো লোভের জিনিশ···৫৫

রসির সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লেই সনাতন "মিছিমিছি থু থু করিয়া থুথু ফেলে ; বলে—আটকুঁড়ি ডাইনি, তুই মরবি কবে?" কিন্তু একদিন কোঁচ, রসি, বৈঠা-হাতে মাছ ধরতে চলার পথে রসির সঙ্গে সনাতনের দেখা হয়ে যায়। "বুড়ি তুরতুর করিয়া চলিয়াছে ; সনাতনের গলার শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া আজ সে-ই পিচ করিয়া খানিকটা থুথু মাটিতে ফেলিলো—"পরিণামে অপমানিত ক্রুদ্ধ সনাতন কোঁচ-হাতে রসিকে আক্রমণ করলে—

> পিছলে পা দিয়া টাল খাইয়াই সে মাটিতে পড়িলো। ভুবন তাহাকে ধরিয়া তুলিলো বটে, কিন্তু রসির মূর্তি তখন ক্রুদ্ধ মার্জারীর মতো ভয়ঙ্কর।···রাগে তার গা ফুলিয়া রোঁয়া খাড়া হইয়া উঠিয়াছে···দৃষ্টি স্থির···চক্ষু জলপূর্ণ···চোখের উপরকার লোল চর্মটা পর্যন্ত যেন কাঁপিতেছে—
>
> ভুবনের বুক কাঁপিতে লাগিলো—
> কিন্তু সনাতন দাঁত মেলিয়া হাসিতে লাগিলো।
> দেখিতে-দেখিতে লোক জমিয়া গেল—

রসি কাঁপিয়া-কাঁপিয়া সবারই সম্মুখে অভিসম্পাত দিলো,—অল্পেয়ে, আমায় মারতে উঠেছিলি ? ভগমান তা' দেখেছেন। তুই মাছ ধরতে চলেছিস্—ঐ মাছই যেন আজই তোকে মারে। বলিয়া রসি চলিতে আরম্ভ করিলো।—৫৬

এর পূর্ব পর্যন্ত গল্প ছিল কার্যকারণসম্পৃক্ত ; কিন্তু লাঞ্ছিত, অপমানিত রসির এই অভিসম্পাতের সূত্র ধ'রে গল্প ক্রমশঃ কার্যকারণহীনতায় হয়েছে অগ্রসর ; সমাপ্তিতে পাঁচুর অনিবার্য পরিণামের মতই দৈব-অভ্যুদয়। গল্পাংশ লক্ষণীয় :

লক্ষ্য অব্যর্থ—শিকার বিদ্ধ হইয়াছে—
জলের উপর রক্ত——
কিন্তু পরক্ষণেই শক্তিশালী জীবের দেহ মোচড় খাইয়া উল্টাইয়া যাইতেই সেই টানে সনাতনও জলে পড়িলো।···

সনাতন হঠাৎ ভয় পাইয়া গেল——
নিঃশব্দ আকাশে যেন একটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিলো——তুই মর্ ।

···কিন্তু মাছটাকে ও নৌকার উপর টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেই মাছের দেহটা ধনুকের মতো বেঁকিয়া পড়ায় তাহাকে তোলা গেল না——

সনাতন দুই হাতে মাছটাকে বেড়িয়া ধরিয়া হাত তোলা করিয়া নৌকায় তুলিবার উদ্দেশ্যে ঝুঁকিয়া পড়িতেই মাছটা লাফাইয়া উঠিলো।

মৃতপ্রায় মাছের দেহে অতো শক্তি কোথা হইতে আসিলো কে জানে--
মাছের সমস্ত দেহের গতিবেগ আর ওজনটা মুদ্গরের মতো উঠিয়া সনাতনের বুকে লাগিলো——

কণ্ঠের ভিতর কেমন একটা কঠিন শব্দ হইলো——
পৃথিবীতে বায়ু নাই——
সম্মুখে আলো নাই——৫৭

এখানেই গল্পের সমাপ্তি হ'লে রসির অভিসম্পাত ব্যর্থ হত না—দৈব-আনুকূল্যে মাতৃ-হৃদয়ের অপমানের প্রতিশোধ সফল হত। এবং শঙ্কা ও ত্রাসগ্রস্ত পাঠকের ঘটত বিমোক্ষণ। গল্পকার এখানে গ্রহণ করেছেন স্বতন্ত্র রচনাকৌশল——কয়েকটি মুহূর্ত পর মূর্চ্ছিত ও প্রায়-নিশ্বাসরুদ্ধ সনাতন জেগে উঠল এবং বিশাল চিতল মাছ সঙ্গে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করল স্ব-গ্রামে। রসির অভিসম্পাত প্রায় ফলবতী হ'য়েও সনাতন রক্ষা পাওয়ায় গ্রামবাসী অনেকেই

হল ত্রাসমুক্ত, তবে "বক্রোক্তি, পরিহাস এবং হাসাহাসি যাহা হইলো তাহাই প্রচুর"। এবং গ্রামবাসী সকলে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে—রসির মন্ত্র-তন্ত্র অন্তঃসারশূন্য ভাঁওতা।

গল্পান্তর্গত চরিত্র ও পাঠকের শঙ্কা ও ত্রাস-ধে অনুভূতির চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত করাই ছিল গল্পকারের অভিপ্রায়। ফলতঃ দেখা যায়—গ্রামবাসীর মধ্যে মহাসমারোহে মৎস্য-বণ্টন হয়। এ-যেন মৃত্যু-পূর্ব জীবন-উৎসব! কিন্তু খেতে বসে রসির অভিসম্পাত হয়ে ওঠে অমোঘ; বুকে মাছের আঘাত পেয়েও নবজন্ম লাভ করেছিল সনাতন; মৃত-মাছের দ্বিতীয় আঘাত এল ভিন্ন-রূপে:

> একগ্রাস ভাত গিলিয়াই সনাতন দুই হাত দিয়া নিজেরই গলা চাপিয়া ধরিয়াছে,···চোখ ঠিকরাইয়া উঠিয়াছে, যেন কেউ ভিতর হইতে ঠেলিয়া দিতেছে।
>
> বাপের চেহারা দেখিয়া মথুর খুব হাসিতে লাগিলো।
> সনাতন আসন ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলো—···
> গলা দিয়া এক ঝলক রক্ত আর একটা যন্ত্রণার অব্যক্ত নিনাদ বাহির হইলো——
>
> তারপর শুইয়া পড়িয়া সনাতন দুই হাত আছড়াইয়া মাটি পিটিতে লাগিলো——গড়াইতে শুরু করিলো; দেহ তার বেঁকিয়া চুরিয়া ভাঙিয়া দুমড়াইয়া গলা দিয়া খালি গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইতে লাগিলো।
>
> মথুর এতক্ষণে ভয় পাইয়া হাসি থামাইয়াছে; কাছে যাইতে সাহস হইলো না; দূরে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলো,—বাবা, থামো থামো।
>
> কিন্তু তার বাবা তখন পরের হাতে, নিজে থামিবার উপায় নাই।—৫৮

দৈব-আনুকূল্যে রসির অভিসম্পাত পেল পুনঃপ্রতিষ্ঠা; মানুষের অভিসম্পাতের কার্যকারণহীন বিজ্ঞানবিমুখ সফলতা, সংগঠন-কৌশল ও আখ্যানের অভিনবত্বে পেল আশ্চর্য শিল্পরূপ। "দিবসের শেষে" গল্পের মতই

আহ্বান-করা বিপদ নিখর উত্থান-পতনহীন গ্রাম্য-জনপদে জাগ্রত করল হৃদয়-বিপ্লব। অবশ্য গল্প-সমাপ্তির ব্যঞ্জনা এখানে পূর্বের গল্পের চেয়ে ভিন্নতর,—নতুন-মাত্রা আরোপিত :

ডাক্তার আসিলেন, বলিলেন,—অ্যাস্ফিক্সিয়া। মাছের শির-দাঁড়ার হাড় বায়ুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া মধ্যপথে আটকাইয়া আছে।—

বসিও আসিয়াছিল; অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল। লুকাইয়া আস্তে আস্তে সে বাহির হইয়া গেল।[৩৭]

৩ খ

সমাজ-অসঙ্গতিজাত ব্যক্তি-অসঙ্গতির শিল্পরূপায়ণ জগদীশ গুপ্তের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য; মাত্রাভেদে এই অসঙ্গতি কখনো বিনাশী-অস্তিত্বে প্রকাশিত, কখনো অস্তিত্বের না-অর্থক বিকৃতিতে পরিণত। কার্যকারণ-বিশৃঙ্খল অদৃষ্ট-চালিত গল্প ব্যতীত প্রায় সব-শ্রেণীর গল্পেই মাত্রাগত তারতম্যে জগৎ ও জীবনের এই বাস্তবপ্রবণ অসঙ্গতি অভিব্যক্ত। পুনরুল্লেখ করা আবশ্যক, সমাজ-অসঙ্গতিজাত এই ব্যক্তি-অসঙ্গতির পশ্চাতে প্রায়শঃ অদৃষ্টবাদী মানুষের বিশ্বাস ক্রিয়াশীল। আমরা বলেছি যে, অদৃষ্টবাদী দর্শন মানুষকে যেহেতু করে স্বাধিকারপ্রমত্ত, সেহেতু রাজনৈতিক-বোধশূন্য গ্রাম্য, অশি-ক্ষিত, দরিদ্র, স্বল্প-শিক্ষিত কর্মহীন মানুষ অসংগঠিত, বিচ্ছিন্ন, ব্যক্তি-স্বাধীন। এবং এজন্যেই অবৈধ যৌনাচারে, কুৎসিত কদর্য জীবন-সন্ধানে, অর্থলোলুপতার অস্বভাবী প্রকাশে তারা অকুণ্ঠিত। ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, কুনীতি-সুনীতি বোধ তাদের বিবেচনাগত নয়; সমাজ-পরিবেশের অনিবার্য কার্যকারণ-সূত্রে এ-ই তাদের উত্তরাধিকার, ফলতঃ যাপিত-জীবন তাদের কাছে দৈব বা অদৃষ্টের অমোঘ বিধান। এ-কারণেই জগদীশ গুপ্তের গল্পে মানবতা বিপর্যস্ত; যদিও নিঃশেষিত নয়। কিছু-কিছু গল্পে ক্ষণপ্রভায় মানবিক মহিমা হ'য়ে উঠেছে উদ্ভাসিত।

'বিনোদিনী' গ্রন্থান্তর্গত "পল্লী-শ্মশান", "পুরাতন ভৃত্য", "প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী" এবং "···পয়োমুখম"—গল্প চারটিতে ব্যক্তি-অসঙ্গতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত। জগদীশ গুপ্ত যে-সব মানুষের অসঙ্গতির শিল্পরূপ দিয়েছেন

তারা কেউ শঠ, প্রতারক, কেউ অর্থগৃধ্নু সন্তান, কেউবা বহিরারোপিত সমস্যায় উন্মাদ, আবার কেউ স্বাধিকারপ্রমত্ত যৌনকামনারাক্ষস। তাঁর ছোট-গল্পের লোকযাত্রায় অসুস্থ ও অসঙ্গত মানুষের ভীড়; এই অসুভাবী জনা-রণ্যে সুশৃঙ্খল ও সুস্থ মানুষ দুর্লভ না-হলেও সুলভ নয়। কিছু-কিছু গল্পে নারী ও পুরুষের ঘটেছে ব্যক্তিত্বসঞ্চারী আবির্ভাব; কখনো বিদ্রোহে, কখনো আপোষহীনতাজাত উন্মাদনায়, কখনো সুস্থ-জীবনের পথ পরিত্যাগ ক'রে জীবনের নঞর্থক বোধে এ-সব নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, অসহায়-মানুষ চেয়েছে পরিত্রাণ।

"পল্লী-শ্মশান" গল্পে অনিকেত বসন্তের উদ্ভ্রান্ত-জীবনের কারণ বর্ণনা-সূত্রে বিস্তারিত হয়েছে মূল আখ্যান। এ-গল্পের প্রধান বিষয় সাম্প্রদায়িক সংস্কার-অন্ধ মানুষের সুপ্ত-মানবতা। মুসলিম সম্প্রদায় পরিবেষ্টিত একটি বিলুপ্ত-প্রায় গ্রামের অবশিষ্ট একটি হিন্দু-পরিবারের একমাত্র পুরুষ রোগাক্রান্ত জিতেন বাবুর মৃত্যুর ফলে দেহসৎকার-প্রশ্নে কাহিনীর সূত্রপাত। যেহেতু এরা স্বধর্মীয় প্রতিবেশী ও স্বজাতীহীন, সেহেতু জিতেন বাবুর মৃত্যুর ফলে দেহ-সৎকার প্রশ্নে গৃহের মহিলারা হন সমস্যার সম্মুখীন। কিন্তু "ইতিমধ্যে যে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সংস্থাপিত হ'য়ে চুকে গেছে এ নূতন তথ্যটা তাঁরা অবগত ছিলেন না।" ফলে মুসলিম প্রতিবেশী এর্‌ফানের বাড়ীতে যখন লোক পাঠানো হল সৎকারের কাঠ সংগ্রহ ক'রে দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে, তখন সাম্প্রদায়িক-সংস্কারের ঘটল মারণান্তিক আত্মপ্রকাশ। অনুরোধের প্রত্যুত্তরে জবাব এল: "কাফেরের মড়া পোড়াবার কাঠ আমরা যোগাইনে।... মাটি দাওগে, তোমরাই পারবে।" প্রাঙ্গণে রৌদ্রতপ্ত মৃতদেহ শায়িত রেখে দূরবর্তী গ্রামে স্বজাতি অনুসন্ধানে গেল এক কিশোর এবং ফিরে এসে অপ-র্যাপ্ত কাঠ-সমেত যখন তারা শ্মশানে উপনীত হল তখন অন্ধকার সমাগত। চিতাগ্নি প্রজ্বলনের পর সৃষ্টি হল ভিন্ন সমস্যা; এখানে গল্পকার সংযোগ করলেন অসঙ্গতির আরেকটি মাত্রা। বুদ্ধিহীন অসহায় স্বসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষও যে অবস্থাভেদে হ'তে পারে বিভ্রান্ত অমানুষ, তারই শিল্পরূপ দিলেন গল্পকার:

"চিতা জ্বালা হ'ল, কিন্তু মুস্কিল অত্যন্ত দুর্যার হ'য়ে উঠতে লাগল ঐ দেহটাকে নিয়েই।...শোথের রুগী, সর্বাঙ্গ ছিল তার জলপূর্ণ, আগুনের আঁচ লেগে জল প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে শেষে সোঁ সোঁ শব্দে

গড়াতে সুরু করল। চিতা নিবে গেল; বার বার অল্প সময়ের জন্য জ্বলে বার বার ধোঁয়া হ'য়ে নিবে গিয়ে কাঠ যখন নিঃশেষ হ'য়ে ফুরিয়ে গেল তখন মৃতদেহ একেবারে অক্ষত, শুদ্ধমাত্র গায়ের চামড়া তার কালো হয়ে গেছে।[৬০]

ফলতঃ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত চার শ্মশানবন্ধু পে'তে বসে বিশ্রামের জন্য নিয়ে আসা বস্তায় মৃতদেহ আর বালি বোঝাই ক'রে নদীতে নিক্ষেপ করে। অসাবধানতার কারণে বস্তার মুখ সুদৃঢ়ভাবে বাঁধা হয়নি বিধায় পরদিন "শূন্যবস্তাসহ মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেরী হ'ল না।" এবং দেখা গেল "·····জিতেনের মৃতদেহ ভেসে উঠে ভাসতে ভাসতে এসে নদীর দুই তীরে এত স্থান থাকতে তাঁদেরই ঘাটে লেগেছিল। শেয়াল কুকুরে তা ডাঙ্গায় টেনে তুলেছে, শকুন নেমে এসেছে, কাক জুটেছে; শকুন, শেয়াল, কুকুর, কাক খাপ্‌টা-খাপ্‌টি কাড়াকাড়ি ক'রে সেই দেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।"[৬১] এই বীভৎস ভোজন-উৎসবের অপবিত্র স্থানটিই উত্তরকালে নির্ধারিত হয়েছে পল্লী-শ্মশানের জন্যে। অন্ধ সাম্প্রদায়িক-সংস্কার সূত্রে কিভাবে একটি জনপদ পরিণত হল শ্মশানভূমে—তার মর্মস্পর্শী কাহিনী পাঠ করতে গিয়ে মনে পড়ে যায় সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গাবিরোধী গল্প হাসান হাফিজুর রহমানের "আরো দু'টি মৃত্যু"[৬২]র কথা। হাসান হাফিজুর রহমানের মতই জগদীশ গুপ্ত সুপ্ত-মানবতার অভ্যর্থনার শিল্পী নন; এই আখ্যান বিন্যাসের পশ্চাতে গল্পকারের সুপ্ত-মানবতার জাগরণ-আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল।

"পুরাতন ভৃত্য" গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নব রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্য" কবিতার কৃষ্ণকান্ত বা কেষ্ট চরিত্রের বিপরীত মেরুর বাসিন্দা; কেষ্টর প্রভু-ভক্তি ও আনুগত্য তুচ্ছ করেছিল নিশ্চিত মৃত্যুভয়, পক্ষান্তরে জগদীশ গুপ্তের নব অবিশ্বাসী, অর্থলোলুপ ডাকাত। ব্রাহ্মণ বিশ্বেশ্বর অপরিচিত মুমূর্ষু নব-কে স্বগৃহে স্থান দিয়ে, স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত স্নেহ-বাৎসল্যে করেছিলেন পরিবারভুক্ত। ভৃত্য হয়েও সে পেয়েছে সন্তানতুল্য সম্ভাষণ। কিন্তু তার এই ছদ্মবেশ একদিন উন্মোচিত হয়েছে; অর্থ-পিপাসার বীভৎস মূর্তিতে আবির্ভূত হ'য়ে সে হরণ করেছে প্রভু বিশ্বেশ্বর-এর সংগৃহীত অর্থ। "প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী"[৬৩] গল্পের বিধৃত জীবন মুসলিম-সমাজ থেকে গৃহীত। এ-গল্পের উপজীব্য প্রসঙ্গ রূপতৃষ্ণাকাতর সদুখাঁ'র পরস্ত্রী-হরণ। গল্পের

শেষে জমির "বৌ নিজেই আসিতে চায় নাই" ব'লে পুনর্মিলন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সমাপ্তির এই ব্যঞ্জনা গল্পকারের গভীর জীবনবীক্ষারই পরিণাম। এ-গল্পে কদর্য রূপতৃষ্ণা, ছদ্মবেশী জীবন এবং এর থেকে উদ্ভূত পারিবারিক বিপর্যয় ও অসঙ্গতি রূপায়িত হ'লেও—অপহৃত নারীর উদ্ধারের ক্ষেত্রে "সত্তর বছরের বুড়ো" অর্জুন নমঃশূদ্রের প্রলয়ঙ্কর আবির্ভাবে সমাজ-অসঙ্গতির সমান্তরাল-রেখায় মানবিক মহিমাই হয়েছে উদ্ভাসিত। "...পয়োমুখম্" গল্পের আখ্যান জটিলতামুক্ত; অশুদ্ধ অর্থ-লালসাই ঘৃণ্য ও কদর্য-রূপে গল্পটিতে প্রকাশিত। "বিষকুম্ভ পয়োমুখম্" অর্থাৎ "মুখে মধু পেটে বিষ"—এই প্রচলিত সংস্কৃত-প্রবচনের শেষাংশ গল্পের নাম-রূপে হয়েছে উপর্যুক্ত। বহুবিবাহ, পণ-প্রথা, পুরুষের ব্যক্তিত্বহীনতা এবং নগ্ন অর্থলিপ্সার সমন্বয়ে গল্পটির কাঠামো সংগঠিত। সমাজে প্রচলিত পণ-প্রথার আনুকূল্যে ভূতনাথের পিতা কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেনশর্মার মারণান্তিক অর্থ-পিপাসা পিতৃত্বের প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাকে করেছে কলঙ্কিত। গল্পে দেখা যাচ্ছে বিপুল অঙ্কের টাকা পণ-আদায়পূর্বক তিনি প্রিয় পুত্র ভূতনাথের বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন, এবং কিছুদিন পর জ্বরাক্রান্ত হ'য়ে পুত্রবধূ মৃত্যু বরণ করে। গল্পের এ-ঘটনায় ছিলনা তেমন আকস্মিকতা, কিন্তু, প্রথমা স্ত্রী মণির মৃত্যুর পর একই উপায়ে এ-সংসারে আগত দ্বিতীয়া-স্ত্রী অনুপমাও অভিন্ন লক্ষণা-ক্রান্ত হ'য়ে বরণ করে মৃত্যু। ব্যক্তিত্বহীন সরল ভূতনাথের সংশয় পূর্বেই জাগ্রত হয়েছিল, এবার তা' বদ্ধমূল আশঙ্কায় রূপ নিল। তৃতীয়া-স্ত্রী বীণাপাণিও যখন অনুরূপ-অবস্থায় শয্যাশায়ী হল এবং পূর্ববৎ চিকিৎসার ভার গ্রহণ করলেন পিতা কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকান্ত, তখন ভূতনাথের সংশয় রূপান্তরিত হয় প্রত্যয়ে; সে আবিষ্কার করে পিতা কৃষ্ণকান্ত কলেরার জীবাণু-বর্দ্ধক বিষ ঔষধের-নামে সেবনে পুত্রবধূকে প্ররোচিত করছেন। গল্পের শেষে তৃতীয়া-স্ত্রী বীণাপাণি নব-জীবন লাভ করেছে, ভূতনাথের ব্যক্তিত্বের ঘটেছে জাগরণ। "...পয়োমুখম্" গল্পে অর্থলিপ্সা ব্যক্তি-অসঙ্গতির নিম্নতর পর্যায়ে অধঃপতিত; পরার্থ সংগ্রহের ক্রূর-বাসনা হত্যা-কারীর ভূমিকায় আবির্ভূত; ফলতঃ সনাতন ভারতীয় পিতৃত্ব-চেতনা বিপর্যস্ত।

"চন্দ্র-সূর্য যতোদিন",৬৪ "মারে কেষ্ট রাখে কে"৬৫। এবং "তরঙ্গ হইতে তরঙ্গে"৬৬ গল্প তিনটির মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত দু'টিতে রূপায়িত বিকৃতি ও

অসঙ্গতি অর্থলিপ্সা, যৌনক্ষুধা ও বহুবিবাহ-প্রথা থেকে আগত। "মারে কেষ্ট রাখে কে!" গল্পে রূপ লাভ করেছে অসুস্থ সমাজ-অভ্যন্তর থেকে ভূমিষ্ঠ এক ছদ্মবেশী চরিত্র। আদালতের নথিপত্রে বহুনামধারী এই চরিত্র এখানে পঞ্চানন-নামে আবির্ভূত। লঘু-রসের এ-গল্পে, চৌর্যবৃত্তির অসতর্ক মুহূর্তে সে গৃহবন্দীত্বের ফাঁদে আটকা পড়ে। তার পরিণাম নিঃসন্দেহে কৌতুকপূর্ণ; কিন্তু গল্পের ঘটনাংশ বিন্যাসে এবং পার্শ্বচরিত্র-দ্বয়ের সংলাপে—সমকাল, মধ্যবিত্তের সঙ্কট, একান্নবর্তী পরিবারের সমস্যা, বেকারত্ব ইত্যাদি বাস্তবিক প্রসঙ্গ কৌতুক-বিদ্রূপের স্পর্শে বিন্যস্ত। পঞ্চানন 'অসাধু সিদ্ধার্থে'র নটবর-এর মত জন্ম-অভিশপ্ত জারজ নয়, জীবনের সুস্থতার প্রত্যাশায়ও সে ছদ্মবেশী নয়—"পঞ্চানন এখন পঞ্চানন, ওরফে গৌরগোপাল, ওরফে সরোজকুমার, ওরফে নিত্য, ওরফে সাতকড়ি"। তবু, ছদ্মাবরণ উন্মোচিত হওয়ার পর সিদ্ধার্থরূপী নটবর যেমন শুদ্ধ জীবনে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত ক'রেও জন্মলব্ধ গুহাবাসে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তেমনি পঞ্চানন চুরিতে ধরা পড়ে স্বীকারোক্তি-মূলক জবানবন্দী দেয়ার পরও, দারোগা-পুলিশের ঝামেলার ভয়ে তাকে থানায় সোপর্দ করা হয়না। চুরি করতে এসে খাটের নীচে লুকিয়ে থাকা শ্রান্ত পঞ্চানন মশার অনবরত রক্তশোষণ সত্ত্বেও ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরে ধরা পড়ার পর সে-যখন উচ্চারণ করে "আজ্ঞে আমি চোর; নাম আমার পঞ্চানন। চোরকে ক্ষমা করুন, আমার যথেষ্ট সাজা হয়েছে"।[৬৭]—তখন তার পূর্ব-ইতিহাস বিস্মৃত হ'য়ে চরিত্রের অন্য একটি ইঙ্গিত ঝল্‌কে ওঠে। কিন্তু পরিণামে সে লাভ করে প্রায় শাস্তি-শর্তহীন মুক্তি। তার এই নিঃশর্ত মুক্তি চির-বন্দীত্বেরই অন্য নাম।

"চন্দ্র-সূর্য যতোদিন" গল্পে পুত্র দীনতারণ বংশগত-প্রথার প্রতি আনুগত্য, পিতৃ-আদেশ শিরোধার্য এবং জননীর অনুমতিক্রমে প্রথমা স্ত্রীর বর্তমানে শ্যালিকা প্রফুল্লর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উল্লেখ্য, অসঙ্গত অর্থ-লিপ্সাই এই ঘটনার কার্যকারণসূত্র করেছে গ্রথিত। কেননা, "এক স্ত্রী বর্তমানে দীনতারণের দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার কারণ শ্বশুর মহাশয়ের সম্পত্তি··· সেই সম্পত্তি তুচ্ছ কন্যাদায়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া সুতা ছিঁড়িয়া দুই অংশে দুই দিকে ঝুলিয়া পড়িবে, এ চিন্তাও ক্লেশকর—"। ফলতঃ অনিবার্য

হ'য়ে উঠল জ্যেষ্ঠা ক্ষণপ্রভার ব্যক্তিত্বের সংকট; সন্তানবতী ক্ষণপ্রভা আত্মপ্রতারণামূলক ভাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পূর্ণতা আবিষ্কার করল তার মাতৃত্বের মর্যাদার মধ্যে। তার মনে হল, দেহ ক্ষণস্থায়ী, দেহাতীত চিরজীবী যে অমৃত সে বহন ক'রে নিয়ে এসেছে, সেটাই পরম; কেননা, "রূপলাবণ্য অতিশয় অসার", "পুত্রবতী স্ত্রী-ই সার ও সেরা"। কিন্তু, রূপলাবণ্যময়ী যুবতী ও সন্তানবতী জননীর মধ্যকার বিরোধের অন্তর্বাস্তবতা ক্রমশঃ হয়ে উঠল অসীম বেদনাসঞ্চারী। ক্ষণপ্রভা পুত্রকে মধ্যবর্তী রেখে পুত্রের পিতার সঙ্গে নিগূঢ় একাত্মতার দাবীতে চালালো নিষ্ফল প্রয়াস। ফলে একাকিত্বের শূন্যতায় হয়ে উঠল তার অনিবার্য গুহাবাস:

> কিন্তু মনের গুহাশায়িত দিব্য দেহটি—যার অনন্ত সংবিৎ—যার অজ্ঞাতে দেহাশ্রিত ভূত-জগতে সূক্ষ্মতম স্পন্দনটি ঘটিতে পারে না—
>
> সে জানে সে একা; ঠিক তারই মতো যদি আর কোথাও কেহ থাকে তবে সে থাক——
>
> কিন্তু সে অদ্বিতীয়——
> আর একটি সে এ-বিশ্বে নাই।[৬৮]

কিন্তু নিষ্ফলা প্রফুল্লর কাছে দীনতারণের সন্তান-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হওয়ার পর দীর্ঘ বিরতি-শেষে ক্ষণপ্রভার স্বামী-শয্যায় পুনর্গমন আবশ্যক হয়ে উঠল। অথচ, ইতঃমধ্যে তার ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে স্ফটিক-সংহতি, স্বামীর প্রতি ঘৃণায় ঘুলিয়ে উঠেছে তার মন—"ক্ষণপ্রভার মনে হইলো তার চতুর্দিকে অন্ধকার ঘিরিয়া আসিয়াছে···স্নিগ্ধ সুবিস্তৃত অন্ধকার নহে···সে অন্ধকার সঙ্কীর্ণ কাঁটার মতো চোখে বেঁধে···সেই অন্ধকারের কেন্দ্রে সে···চারিদিকে যাহারা বিচরণ করিতেছে তাহারা যেন এ-পৃথিবীর মানুষ নয়···তারা এমনই বিকৃত, বীভৎস।"[৬৯] স্বামী-শয্যায় প্রবেশ করতে গিয়েও ক্ষণপ্রভার মনে হয়েছে:

> ···অদূরবর্তী ঐ লোকটা কেবল একটা মাংসপিণ্ড—যেমন কদর্য তেমনি লোলুপ; তার মাংসাশী দেহটা যেন সর্বাঙ্গ দিয়া হা করিয়া আছে ···মন দিয়া ঐ দেহ স্পর্শ করা সে যেন স্মরণাতীত কোন যুগে পরিত্যাগ করিয়াছে—[৭০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মধ্যবর্তিনী" গল্পের হরসুন্দরীর বেদনারঞ্জিত মনোভাব এখানে সম্প্রসারিত হ'য়ে লাভ করেছে ব্যক্তিত্ব-সংহত তীর্যক ভূমিকা। জগদীশ গুপ্ত তাই রাবীন্দ্রিক-সমাপ্তিতে তুষ্ট নন; যন্ত্রণাদগ্ধ ব্যক্তিত্ব-আহত এই নারীসত্তাকে তিনি বিপর্যয়ের চরম শূন্যতায় নিক্ষেপ করেছেন। গল্প-কার যদিও ইঙ্গিতময় ভাষ্যে বলেছেন: "কিন্তু দেবতা তার প্রাপ্য অর্ঘ্য আদায় না করিয়া ছাড়িলো না।"—তবু গল্পের শেষে আমরা দেখি দেহ-বুভুক্ষার মাতৃত্ব-গ্রাসী আগ্রাসনের পরিণামে ক্ষণপ্রভা "সম্পূর্ণ উন্মাদ; কিন্তু ছেলেটি বুকে আছেই।"

"তরঙ্গ হইতে তরঙ্গে" গল্পের পরিবেশও অসঙ্গত, অস্বাভাবিক; প্রথমা স্ত্রী গুণবতীর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধবাসরেই বঙ্কু গুঁইয়ের বিবাহের প্রস্তাব উত্থা-পিত ও গৃহীত হয়। দ্বিতীয় বিবাহে বঙ্কুর সম্মতির পশ্চাতে মাতৃহীন সাত-বছরের পুত্রের লালন-পালনের অকাট্য যুক্তিটি প্রাধান্য অর্জন করলেও বঙ্কু গুঁইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যত্র প্রতিফলিত—"···প্রথমা স্ত্রী গুণবতীর কথা তার সমগ্রভাবে মনে আছে—যেমন একটি পিণ্ডাকার অদ্ভুত বস্তুর কথা মানুষের দৈবাৎ মনে থাকিতে পারে।" দ্বিতীয়া স্ত্রী গিরিজারও সন্দেহ রইল না—যে "অত্যন্ত মোটা আর তৃতীয় শ্রেণীর বাস্তব জিনিশ অশন ও বসন ব্যতীত অতি-অকারণ, স্পষ্ট এবং সূক্ষ্মোপভোগ্য আনন্দের মাল্যভূষণ উপহার দিতে উনি সক্ষম হইয়াছেন।" সাত-বছরের পুত্র নন্দ নবাগতা জননীকে 'মা' ব'লে আহবান করে; গিরিজা "গদ্‌গদ্ হয় না, আহ্বানকে প্রত্যাখ্যানও করে না, অর্থাৎ সে স্বাভাবিক।" কিন্তু একসময় তার অন্তরেও জাগ্রত হয় অকপট মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। গিরিজা যখন সন্তানের জননী হল, তার অনেক আগেই বঙ্কুর সঙ্গে গিরিজার বয়সের ব্যাপক তারতম্য জন-চিত্ত থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। কিন্তু গল্পের শেষে পারিবারিক আনন্দ ও তৃপ্তিকে অতিক্রম ক'রে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কণ্টকিত এক অসুস্থ ক্লিন্ন জগৎ উন্মোচিত হয়েছে। সমাপ্তিতে আমরা দেখি ক্রীড়ারত দ্বিতীয়-পক্ষের পুত্র চন্দরের প্রতি লক্ষ্য রে'খে প্রতিবেশী একটি ছেলে অন্য ছেলেদের বল্‌ছে "দেমাক দেখো! বুড়োর বেটা। চন্দর তার বাবার নাতি, জানিস তোরা?" এই বিদ্রূপ-বাণ বঙ্কু ও গিরিজার কর্ণমূল ভেদ ক'রে অন্তস্থ হৃদয়ে হয়েছে বিদ্ধ, এবং সীমাহীন আনন্দ ও সুস্থ পারিবারিক-শৃঙ্খলায় ঘটেছে অবশ্যম্ভাবী

বিপর্যয়; গল্পকারের ইঙ্গিতময় ভাষায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাত্র-পাত্রীর মানস-বিচ্ছিন্নতা :

> বঙ্কু তখন কালের সীমাহীন প্রাচীনত্বের আর জীর্ণতার সঙ্গে একাকার হইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে . . . গিরিজা তার দ্বাবিংশতি বর্ষের একটি অতি সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ স্থানের ভিতর ঘুরপাক খাইতেছে . . .[৭১]

"আদি কথার একটি",[৭২] "শঙ্কিতা অভয়া",[৭৩] "বেলোয়ারী চৌপ"[৭৪] এবং "কলঙ্কিত সম্পর্ক"[৭৫] গল্পের জগৎ আরো ভয়াবহ; মানুষ সেখানে দৈহিক বাসনাতাড়িত কামনারাক্ষস। প্রথম ও তৃতীয় গল্পে অভিব্যক্তি পেয়েছে আত্মবিবরবাসী মানুষের প্রাগৈতিহাসিক প্রবৃত্তি—ঈষদুত্তরকালে, প্রায়-অভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "প্রাগৈতিহাসিক" গল্পে এই প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে :

> হয়তো ও চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারা-বাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংস আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।[৭৬]

"আদি কথার একটি"—এই অভিধার বিভ্রান্তশুদ্ধ ও পরিশীলিত নামান্তর "প্রাগৈতিহাসিক"-শিরোনামায় অভিব্যঞ্জিত। আলোচ্য-গল্পে উন্মোচিত হয়েছে লিবিডো-তাড়িত মানুষের "গুহানিহিত" দেহ-বুভুক্ষা এবং অদৃষ্টবাদী মনুষের দৈব-আস্থা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬)-তেও যুগপৎভাবে অদৃষ্ট ও লিবিডো-তাড়িত মানুষের চলচ্চিত্রায়ণ আমরা লক্ষ্য করেছি। বর্তমান গল্পের নায়ক কৃষিজীবী বেণী পাঁচ বছরের মেয়ে খুশী-কে বিয়ে করে বিধবা যুবতী-শাশুড়ী কাঞ্চনের সহবাস প্রত্যাশায়। বিবাহোত্তরকালে বেণী গ্রহণ করে কদর্যকৌশল; কেননা সে জানে—

> খুশিকে বিবাহ করা ছাড়া কাঞ্চনের হামেশা নাগাল পাইবার উপায় তার ছিলো না। আবার ইহাও সত্য যে, কোমরের ব্যথাটাও তার

মিথ্যা। কাঞ্চনকে একান্ত সন্নিকটে আনিতে হইলে ঐ কোমরে ব্যথার একটা হেতু সৃষ্টি করাই দরকার।[৭৭]

বেণীর এই বিকৃত-কামনার সূত্র ধ'রে 'কাঞ্চনা'-ও ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়েছে তাম্রখণ্ডে। প্রথমে বেণীর অসংযত আচরণে মেয়ের মুখটিই তার চোখে উদ্ভাসিত হয়েছে। ঘৃণায়-বেদনায় বেণীকে সে বিতাড়িত করেছে স্ব-গৃহ থেকে। কাঞ্চনের মনে হয়েছে "যে অমৃতকুণ্ড একদিন কানায়-কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে চাহিয়াছিল, তাহার শূন্যতা যে এতো গভীর, এতো শুষ্ক আর এতো তৃষিত তাহা তাহার যৌবনের সুপ্রচুর দীপ্তরাগেও লক্ষিত হয় নাই। সেই অপার শূন্যতায় আর্তশ্বাস কোথা হইতে আজ এমন ক্ষিপ্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া আঘাতে-আঘাতে তার ভিত্তি পর্যন্ত টলাইয়া দিতে চাহিতেছে!"[৭৮] কিন্তু বালিকা খুশী মধ্যবর্তিনী হ'য়ে সুবলের সঙ্গে তার ব্যবধানকে চিহ্নিত করে রেখেছে। শিশু-কন্যা ও যুবক-জামাতার শয়ন-দৃশ্য দেখে কাঞ্চনা উপলব্ধি করেছে—"পুরুষত্বের পূর্ণবিকাশে সর্ব-দেহের অসাধারণ তেজপ্রাচুর্যে একজন যেন পৃথিবীর সমস্ত মনহীন রসহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া এখন শুধু সর্বব্যাপী ক্লান্তিতে ভারাক্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পাশে পড়িয়া আছে একটি অতিশয় শিশু।"[৭৯] কাঞ্চনা এ-ও অনুভব করেছে সুবলের বহুদিনের স্খলিত আকাঙ্ক্ষা শামুকের মত ধীরে ধীরে হেঁটে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবৈধ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য কাঞ্চনা আর্তচিৎকার ক'রে বলেছে "ভগবান, আমায় বাঁচাও, বাঁচাও!" কিন্তু কামনা-রাক্ষসী পরাভূত হয়েছে মাতৃত্বের কাছে; অনুক্ষণ তার চিত্তে সুবলের আহ্বানের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ঘন প্রতীক্ষা :

> খুট করিয়া একটু শব্দ। কোথায় তার ঠিক নাই—
>
> অমনি কাঞ্চনের কান, মন, স্নায়ু, জ্ঞান যেন রোমে-রোমে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া ওঠে। বেলায় যতো ভাঁটা পড়ে মন তার ততো সচেতন হয়। ঘর্ঘর করিয়া তার জাঁতা চলে। সপসপ করিয়া তার ঝাঁটা চলে। খরখর করিয়া তার খুন্তি চলে। কিন্তু সকল শব্দের অন্তরালে একটি ক্ষুদ্রতম শব্দ, একটি আগমনবার্তা, ক্লান্ত এতোটুকু সুর, তার কল্পনার সুদূর দিগন্তরাল হইতে অবিশ্রান্ত মাথা তুলিতে থাকে। হঠাৎ সে থামিয়া পড়ে, শব্দ যেন আসিয়াছে। পরক্ষণেই তার হতাশা আর

ক্লেশের অবধি থাকে না, এতো আশার প্রথম শব্দটি বুঝি এড়াইয়া গেছে।
কাজ ফেলিয়া বহুক্ষণ সে উৎকর্ণ হইয়া থাকে
হঠাৎ একদিন অভ্যস্তক্ষণে না আসিলো শব্দ, না উঠিলো ধোঁয়া।৮০

পক্ষান্তরে, এতদিনে কাঞ্চনের মনের খবরও জানা হয়ে গেছে সুবলের; কেননা "মনের সেই তীব্র প্রকাশ বর্বরেরও, অন্তত আংশিকভাবেও, না-বুঝিবার কথা নয়।" কিন্তু এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিঘ্ন, বিরাগ ও বিপত্তির হেতু নির্ণয় অন্ধ সুবলের অসাধ্য। গল্পের শেষ পর্যায়ে আমরা দেখি কাঞ্চন-সুবল ঐ-প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারকেই করেছে সম্প্রসারিত।

"শঙ্কিতা অভয়া" গল্পে রূপায়িত হয়েছে অবিশ্বাস, অসঙ্গতি ও যাপিত জীবনের ভিন্নরূপ। পিতা-পুত্রীর—অতি-আধুনিক জীবনাচার, "প্লেটোনিক লাভ", নরনারীর বৈবাহিক সম্পর্ক, যৌন-আকর্ষণের দুর্বারতা ইত্যাদি প্রসঙ্গের আলাপচারিতায় জননী-অভয়া শঙ্কিত; কেননা পিতা অতুলের স্বরূপ কন্যা-শান্তিময়ী জানেনা, এবং সে এ-ও অবগত নয় যে, অতুল তার সৎ-পিতা, জননী-অভয়া কুলত্যাগিনী। গল্পের একটি পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে অতুল নৃত্যরতা শান্তিময়ীর মুখের রক্তাভ ঘর্মবিন্দু পর্যবেক্ষণ ক'রে ক্রমশঃ বুভুক্ষ-কামনায় পিতৃ-অভিনয়ের ছদ্মাবরণ উন্মোচন ক'রে দিচ্ছে:

> ···অতুলের অকস্মাৎ যা মনে হইলো, এমনি দৃশ্যের সমগ্র পরিবেশের অভ্যন্তরে তা অস্বাভাবিক নয়, অন্তত তার পক্ষে এবং তারও পূর্বে নৃত্য ভঙ্গিতে প্রেমের যে-ইন্দ্রজাল রচিত হইয়াছিল তাহাও ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলো, আর, সকলে মিলিয়া অতুলের মনে পড়াইয়া দিলো, নারীর সঙ্গে পুরুষের নিকটতম যে-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে দেহ একবার হয় অগ্নিগর্ভ, একবার হয় রোমাঞ্চিত সেই সম্বন্ধটি···৮১

আশঙ্কাই এই গল্পে পূর্বাপর রূপলাভ করেছে; বিপর্যয় ঘনীভূত হয়নি। কিম্বা পারিবারিক-শৃঙ্খলাও হয়নি অমোচনীয় অসঙ্গতিতে বিদ্ধ। গল্পের শেষে শান্তিময়ীর কাছে পিতা-পুত্রী-সম্পর্কের জটিলতা উন্মোচিত হয়েছে; শঙ্কিতা অভয়ার আশঙ্কারও ঘটেছে নিবৃত্তি। কিন্তু "বেলোয়ারী টোপ" গল্পে বিপর্যস্ত হয়েছে পারিবারিক শৃঙ্খলা; স্বাধিকারপ্রমত্ত ভারত-এর সঙ্গে ভাগ্নী মৃণ্ময়ীর স্থাপিত হয়েছে অবৈধ যৌন-সম্পর্ক; অঙ্কুরিত হয়েছে বিষবৃক্ষের

অনিবার্য অঙ্কুর। এতদ্ব্যতীত গল্পটি অন্য একটি কারণেও তাৎপর্যবহ। এতে সংলাপহীন, নীরব এক নারী-চরিত্রের ঘটেছে আকস্মিক উদ্ভাসন ; ভারতের গর্ভবতী-স্ত্রী অনাচারী স্বামীর দৌরাত্ম্যে অপমানাহত ব্যক্তিত্বে জাগ্রত হয়েও অস্তিত্ব-বিনাশের পথকেই বেছে নিয়েছে ; আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে অপমান, লজ্জা ও ঘৃণার ঘটিয়েছে অবসান।

"বেলোয়ারী টোপ" গল্পের পোড়া-বৌ-এর মতই "কলঙ্কিত সম্পর্ক" গল্পে মাখনের ব্যক্তিত্বসঞ্চারী আবির্ভাব ; যদিও তার পরিণতি আত্মবিনাশে নয়, অস্তিত্বগ্রাসী অপমানের প্রতিক্রিয়ায় সে উন্মাদও হয়নি ; বিবেচিত হয়েছে অবাঞ্ছিত-রূপে, হয়েছে গৃহ-বিতাড়িত। সাতকড়ির স্ত্রী মাখনের এই পরিণাম তার নিজের কাছে অপ্রত্যাশিত নয় ; বরঞ্চ যে-আত্মসম্মানবোধে সে জাগ্রত হয়েছে, সেখানে গৃহ থেকে বিতাড়নের স্থূল-অপমান তুচ্ছাতিতুচ্ছ। মেয়ে-ঘটিত অপকীর্তির দায়ে দেড় বৎসর কারাবাস-শেষে সাতকড়ি ওরফে সাতুর গৃহ-প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র ক'রেই "কলঙ্কিত সম্পর্ক" গল্পের মূল আখ্যান বিকশিত। বাড়ীর অন্যান্য সদস্য যেখানে সাতুর আগমন-অভ্যর্থনায় তৎপর, সেখানে তারই স্ত্রী মাখনবালা নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত, এই দেড় বৎসরের "সূর্যের উদয়াস্ত-ব্যাপী জীবন আর দিনগুলিকে" তার মনে হয়েছে অতি-সংক্ষিপ্ত। স্বামীর অপকীর্তি তার চেতনায় ক্রমশঃ সঞ্চার করেছে আত্মসম্মান-জাত ঘৃণা ; ফলতঃ স্বামীর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই মানসিকভাবে সে সংসার-বিচ্ছিন্ন ; সাতুর সঙ্গে তার স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক তখন অবাঞ্ছিত কালিমা-লিপ্ত :

> কিন্তু মাখনের সকল দুঃখ আর অসহিষ্ণুতার উপর যেন অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিলো এই বেদনাটাই যে, যে-পুত্র সমুদয় পৃথিবীর সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহাদের সবাইকে এমন করিয়া পাঁকে ডুবাইয়া লইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে সে-পুত্র কেমন পুত্র! এই চোখের জল সর্বকালের এবং সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অবমাননা—জননীর বুকের স্নেহের অঙ্গে কলঙ্কের কালিমা লেপন। ইহা অভদ্র।[৮২]

জগদীশ গুপ্তের বিপর্যস্ত-মানবিকতার জগতে মাখন ব্যতিক্রমী চরিত্র ; মনুষ্যত্বের অবমাননায় সে লজ্জিত ; এই লজ্জা থেকে উদ্ভূত ঘৃণা তাকে বাধ্য করেছে স্বামীর সঙ্গে মনোদৈহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে। কেননা—

সব লুপ্ত হইয়া গেছে—মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপর নিপতিত জলবিন্দুর মতো সে এতোবড়ো ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় যাইয়া আশ্রয় লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেছে, তাহার উদ্দেশ নাই।৮৩

ফলে শয়ন-গৃহে স্বামীর প্রসারিত হাতের দিকে চেয়ে সে বলেছে "আমায় ছুঁয়োনা না"। কেননা কলঙ্কিত হাতের স্পর্শের পরিণাম "ভালো হবেনা"। গল্পে ঘটলও তাই, মাখন আত্মসমর্পণ না ক'রে মারণোদ্যত হওয়ায় হ'ল গৃহ-বিতাড়িত। এবং এ-ভাবেই জগদীশ গুপ্তের গল্পের অসুস্থ পঙ্ক-ভূমে প্রস্ফুটিত হল পঙ্কজ, মানবতা-সঞ্চারী ব্যক্তিত্বে যার উদ্ভাসন।

'জগদীশ গুপ্তর গল্প' গ্রন্থের সম্পাদক সুবীর রায়চৌধুরী "কলঙ্কিত সম্পর্ক" গল্পের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ফাঁসি"৮৪ গল্পের সাদৃশ্য-সন্ধান৮৫ করেছেন। তাঁর এই অনুসন্ধান নিঃসন্দেহে তৎপর্যপূর্ণ। "ফাঁসি"র মূল আখ্যান "কলঙ্কিত সম্পর্কে"-রই অনুরূপ। এ-গল্পেও দেখি জেল ফেরৎ গণপতিকে নিয়ে সারা বাড়ীতে যখন অভ্যর্থনার আয়োজন, তখন বাড়ীর মেজবৌ রমা যুগপৎ লজ্জা ও ঘৃণায় আড়ষ্ট—স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের অচ্ছেদ্য বন্ধন থেকে মুক্ত, বিচ্ছিন্ন। বস্তুতঃ আখ্যানের সাদৃশ্য সত্ত্বেও রচনারীতি ও জীবনবীক্ষায় গল্প দুটি সঞ্চার করেছে স্বতন্ত্র রসাবেদন। জগদীশ গুপ্তের মাখন ব্যক্তিত্বের জাগরণে আপোষহীন-অস্তিত্ব, পক্ষান্তরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রমা ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসনে সচকিত হয়েও, পরিচিত লোকালয় ছেড়ে উভয়ের পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেছে স্বামীর কাছে। কিন্তু স্থূল গণপতির কাছে মান-অপমান, কটাক্ষ-অবহেলা, নিন্দা-ব্যঙ্গ বিবেচনাধীন নয়। ফলে নিরুপায় রমা বেছে নিয়েছে আত্মবিনাশের পথ; ফাঁসি-কাষ্ঠ থেকে ফিরে আসা স্বামীর প্রকৃত শাস্তি অপমানাহত রমা আরোপ করেছে নিজেরই উপর। গল্পের শেষ দুই বাক্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাপ্তির আকস্মিক ব্যঞ্জনায় এই সংবাদ পরিবেষণ করলেন—"পরদিন সকালে রাজেন্দ্র উকিলের বাড়ীতে একটা বিরাট হৈ-চৈ শোনা গেল। বাড়ির মেজবৌ রমা গলায় ফাঁসি দিয়া মরিয়াছে।"৮৬

জগদীশ গুপ্তের জগৎ অসঙ্গতির; তাঁর রূপায়িত অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীর মধ্যেই মানবতাবোধ সুপ্ত; কামনা-বাসনা, লালসা-লিপ্সাই তাদের আরাধ্য;

ঘৃণ্য-কদর্য-অবৈধ আত্মগুহাবাসে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্ব-কৃত-কার্যের দায়-ভাগ অদৃষ্টের উপর চাপিয়ে তারা নিশ্চিন্ত। যুগ ও সমাজের এই বাস্তবিক 'পঙ্কতিলক' জগদীশ গুপ্তের গল্পে চিহ্নিত। এবং জগদীশ গুপ্ত শুধুমাত্র নৈরাশ্যের চারুশিল্পী নন ব'লেই, তাঁর গল্পে বিপর্যস্ত মানবতার পাশাপাশি লক্ষ্য করি মনুষ্যত্বের অভ্যুদয়।

৩ গ

জগদীশ গুপ্তের গল্পে প্রেমের-জগৎও অসঙ্গতি-যুক্ত; তাঁর চরিত্রসমূহের প্রেমবোধ সর্বদা দেহজ-কামনার পঙ্কে বিকৃত। ফলতঃ, প্রেমের গল্পেও মানুষের অন্তর্গত অসঙ্গতি পালন করেছে মুখ্য ভূমিকা। ইতঃপূর্বে অনুসৃত বাংলা কথাসাহিত্যের প্রেমবিষয়ক-ধারণা এখানে অপাঙ্‌ক্তেয়; জগদীশ গুপ্তের প্রেমিক জৈবকামনারাক্ষস; লিবিডোর অন্ধ একাধিপত্যে মন-নিরপেক্ষ দেহ তাদের কাছে স্বর্গীয় নৈবেদ্য। সমাজের আরোপিত অসঙ্গতির বাস্তবতাই তাঁর চরিত্রসমূহকে করেছে নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন। সংস্কার, লোকাচার, সামাজিক অনুশাসন এবং শ্রেণী-বৈষম্যের সূত্রেই অসংগঠিত এ-সব বিচ্ছিন্ন অদৃষ্টবাদী ব্যক্তি-মানুষ তাদের নিজ-জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী একনায়ক; অবদমিত ক্ষুধা ও বুভুক্ষার আগ্রাসী-শক্তি।

"অরূপের রাস"[৮৭], "আশা এবং আমি"[৮৮], "শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী"[৮৯] ও "অপহৃত আকাশকুসুম"[৯০] গল্পে দেহ-সাপেক্ষ এবং বিবাহ-নিরপেক্ষ ক্ষুধা ও আসক্তির নামান্তর-রূপে প্রেমের আবির্ভাব। "আশা এবং আমি" গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের উত্তম পুরুষের ভাষ্য লক্ষণীয়:

> পাশের বাড়ির ষোড়শী কুমারী শ্রীমতী আশাকে আমি, শ্রীবিভূতি, একেবারে নিজস্ব করিয়া পাইতে চাই—বিবাহ হইতে পারে না, তবু চাই।···বিবাহ তো সেই ব্যাপারই! বিবাহ একটি নারী এবং একটি পুরুষকে পরস্পরের একেবারে নিজস্ব করিয়া পাওয়াইয়া দেয়।[৯১]

> বিবাহ আমি করি নাই; কিন্তু জানি যে, বিবাহ অতিশয় ভদ্র, এবং প্রচণ্ড রবে বিঘোষিত পবিত্র অনুষ্ঠান। কিন্তু ইহাও জানি যে, মূল ইচ্ছাটা ধর্মপালন নয়, নিজস্ব করিয়া পাওয়ার।···

আশাকে আমি ভালবাসি, যদি ভালবাসার নাম হয় তার দেহটাকে নিজস্ব করিয়া পাওয়ার ইচ্ছা। দৈহিকভাবে ধরা দিবার আগে ছোটে মন—মনে মন বাঁধা পড়িয়া কেহ হয় পদলুণ্ঠিত বা কণ্ঠলগ্ন। আশার মন আমি পাইয়াছি, আবিষ্কারের পর অধিকার করিয়াছি; কিন্তু নিরাকার মন কিছুমাত্র উপভোগ্য নয় যদি রূপময়, ভোগায়তন আর সুখাবহ বস্তুগৌরবের গরীয়ান দেহ থাকে স্পর্শাতীত অনধিগম্য হইয়া··· সে বড় যন্ত্রণা।[৯২]

বিভূতির আকাঙ্ক্ষার জগৎ একান্তই বস্তুগত, রূপ তার "বিবেচ্য নয়"—"আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী"র মত "যৌবনপুষ্ট সুস্থ নিটোল দেহ"ই তার কাম্য। ভারতবর্ষের সংক্ষুব্ধ দেশকাল থেকেই বিভূতি ও আশা চরিত্রের উত্থান। দেহ তাদের উভয়ের কাছে বিবাহ-নিরপেক্ষ স্বাভাবিক সম্ভোগ-সামগ্রী। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়:

—হাস্যপূর্বক স্বীকার করিতেই হইবে যে, সেদিক দিয়া আশা আমাকে একবিন্দু অপরিতৃপ্ত রাখিল না—প্রথম দিনেই সে চমৎকার নিষ্ঠা আর শারীরিক প্রগলভ উৎসাহের সঙ্গে ধরা দিল···আশাও তৃপ্ত দানশীল হইয়া আমাকে মুহুর্মুহুঃ ঝলকে ঝলকে অমৃত পান করাইয়া অজ্ঞান সমাধির পর যেন অমরত্ব দান করিল।[৯৩]

গল্পের শেষ-পর্যায়ে পঙ্ক-গহ্বর থেকে আত্মপ্রবঞ্চনামূলক মুক্তি সন্ধান করেছে বিভূতি ও আশা; সামাজিক অনুশাসন অগ্রাহ্য ক'রে আবদ্ধ হয়েছে বিবাহ-বন্ধনে; অনুভব করেছে দেহ-সাপেক্ষ আত্মার শান্তি; উপলব্ধি করেছে নবতর জীবনের মাঝে "অসীম মুক্তির নূতনতর রূপ"। গল্পের এই পরিণাম আকস্মিক এবং জগদীশ গুপ্তের গল্পের সাংগঠনিক রীতির ব্যত্যয়। যদিও এই পরিণাম পাঠক-চিত্তে স্থায়ী হয়না; চরিত্রের বিকৃতি, অসঙ্গতি এবং প্রবৃত্তির অকপট নিরাভরণ উচ্চারণই স্মরণীয় হয়ে থাকে।

"অরূপের রাস" গল্পে, সূচনার নীরব ও আত্মগত প্রেম পরিশেষে বিকৃতিতে হয়েছে পরিণত। বিবাহ-সূত্রে কানু ও রাণুর বিচ্ছিন্নতা অস্বাভাবিক নয়। বলাবাহুল্য, বিবাহ-উত্তরকালে রাণুর অন্তর্গত প্রণয়াভিসার প্রচলিত সমাজধারায় নিষিদ্ধ। তবু, রাণু তার পুত্রের নামকরণ করেছে বেণু।

কানুর অনুষঙ্গে 'বেণু' শব্দটি যুগপৎভাবে সৃষ্টি করেছে ধ্বনি ও অর্থের দ্যোতনা। এই পর্যন্ত গল্পের আখ্যান জটিলতামুক্ত, স্বাভাবিক। কিন্তু গল্পের শেষ পর্বে দেখি, রাণু কানুর-স্ত্রী ইন্দিরাকে বলছে "আয়, বৌ, তুই আর আমি এক হয়ে যাই।" এর উত্তর-প্রত্যুত্তরে আশঙ্কার যে জটিলতা যুক্ত হয়েছে, তা উদ্ভট বিকৃতির নামান্তর :

> ইন্দিরা সমগ্র ব্যাপারটা কী ভাবে গ্রহণ করিলো সে-ই জানে, সহজ কণ্ঠেই বলিলো, 'আমি বলিলাম, পারো হও। কিন্তু একজনকে তাহ'লে বৌ খোয়াতে হবে।'—রাণু বল্‌লে, 'কানুদাকে জিগগেশ করিস সে খোয়াতে রাজি আছে কিনা।'
>
> —'মোটেই না'। বলিয়া ইন্দিরাকে আলিঙ্গন করিতে হাত উঠি-উঠি করিয়াই থামিয়া গেলো। বলিলাম,'বসন্তবাবুর সঙ্গে একটা আপোশ ক'রে নিতে পারলে একরকম বন্দোবস্ত করা যায়।···[৯৪]

গল্পটির সমাপ্তিতে প্রেমের এই বিকৃতি ধারণ করেছে ভয়াবহ রূপ। স্বামী বসন্তবাবু অন্য শহরে বদলী হয়ে যাবেন ব'লে রাণু ইন্দিরাকে তার বাসায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে কানুর অনুমতি চায়—"বৌ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে। আর তো দেখা হবে না"। রাণুর বাড়ীতে রাত্রিবাস-সূত্রে ইন্দিরার অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও কৌতুক এবং কানুর আত্মপ্রবঞ্চনামূলক পরিতৃপ্তি, প্রেমের বিকৃত, অসঙ্গত রূপকেই করেছে ঘনীভূত। গল্পের সমাপ্তি-অংশ অনুধাবনীয় :

> —'রাণুটা একটা পাগল।'
> —'অবার কী বললে ?'
> ইন্দিরা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'কে জানতো···'
> বলিয়া থামিয়া খুব হাসিতে লাগিলো।
> আমি নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইন্দিরার হাসি থামিলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কথাটা কী ?'
> ইন্দিরা বলিলো,—'যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি।'
> একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া গেলাম।——

ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক্ রক্ত পূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে! ···আমি তৃপ্ত।[৯৫]

"শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী" গল্পে রূপ পেয়েছে অন্তর্গত পরকীয়া প্রণয়াভিসার। গল্পের কাহিনী-অংশ বিস্তারিত হয়েছে বিপত্নীক কবিরাজ শশাঙ্ক-শেখর গুপ্তের পুনর্বিবাহ-উপলক্ষে। নিমন্ত্রণ খেতে এসে বন্ধু সতীশ শশাঙ্ক কবিরাজের অবরোধবাসিনী স্ত্রীর 'অনাবৃত মুখ' চকিতে দেখে ফেলে। এবং তার মনে হয়—"চোখ নামাইবার ভঙ্গিটি চমৎকার—তাহাতে নিষেধের অধিকার নামিয়া আসিলো না···সেই স্ফুটিত শতদল একটি নিমেষের জন্য দলগুলি ঈষৎ সঙ্কুচিত করিলো মাত্র—"[৯৬]। ফলতঃ একদিনের এই চকিত দর্শনে কাব্যামোদী সতীশের কাছে কবিরাজ-স্ত্রী হয়ে ওঠে "বিরহী যক্ষের প্রিয়া", "কাব্যলক্ষ্মী মানসী"। কিন্তু গল্পের সমাপ্তি-পর্বে, শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা—এই সংবাদে সতীশের অন্তর্গত পরকীয়া প্রণয়াভিসার হয়েছে স্বপ্নভঙ্গে স্তব্ধ। পূর্বে যাকে মনে হয়েছিল—"এই অক্ষয় যৌবনা মানুষকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে আকর্ষণ করিয়া আনে··· ইহাকে বাদ দিয়া মানুষ স্বর্গকে কল্পনা করিতে পারে নাই[৯৭]··· ইহাকে অন্তরালে রাখিয়া কবির কাব্যরচনা সার্থক হইতে পারে না···", তারই জননীত্বের সংবাদে সতীশের "নিস্তব্ধ অন্তরঙ্গতা" হ'য়ে গেল "দ্বিখণ্ডিত"; —"বিন্ধ্য-গিরি যেমন সূর্যের পথরোধ করিয়া শিরোত্তোলন করিয়া ছিলো, তেমনই দুর্লঙ্ঘ্য একটি প্রাচীর তাহার ভাবস্রোতের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া খাড়া হইয়া উঠিলো—"[৯৮]—সতীশের মনে হলো "এ সে নয়।" "অপহৃত আকাশ-কুসুম" গল্পের নায়ক চল্লিশোর্ধ্ব প্রৌঢ় উল্লাস চৌধুরী পাঁচ সন্তানের জনক হ'য়েও, চিন্তা ও আচরণে "চির-যুবক"। কিন্তু নবজাত দৌহিত্র-সন্দর্শনে যাবার পথে নির্জন স্থানে ছয়-বছরের বালক-সমেত এক রমণীকে দেখে তার স্বপ্নভঙ্গ হয়; উল্লাস চৌধুরী আবিষ্কার করে "নির্জন স্থানে একাকিনী এক রমণীর নিকটবর্তী হইয়া তাহার মুখখানা স্পষ্ট চোখে পড়িলো; কিন্তু চোখে পড়িয়াও সে অন্তরে প্রবেশ করিলো না কেন! কেন মনে পড়িলো না, রমণী চিরকালই রমণী! উল্লাস চৌধুরী অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিলো; নিজের কাছেই জানিতে চাহিলো, তবে কি আমি বুড়ো হয়েছি?"[৯৯]

এভাবেই জগদীশ গুপ্তের গল্পে প্রেম কখনো ব্যক্তি-অসঙ্গতির ছিদ্র বেয়ে, কখনো অবৈধ পরকীয়ার অন্তর-অভিসারে, দেহজ কামনার উত্তুঙ্গ বিকারে,

অথবা সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে হয়ে উঠেছে স্বাধিকারপ্রমত্ত। বলাবাহুল্য, বাস্তবিক অসঙ্গতিপূর্ণ জগতের গর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে জগদীশ গুপ্তের নরনারীর প্রেমভাবনার এই অস্বাভাবিক বিকার।

৩ ঘ

দুই বিশ্ব-সমরের মধ্যবর্তী ও উত্তরকাল পৃথিবী ব্যাপী শ্রমরাক্ষস ও মুদ্রা-রাক্ষসের লেলিহান জিহ্বায় আক্রান্ত; একদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের মারণান্তিক আগ্রাসন, অন্যদিকে কৃত্রিম অর্থনৈতিক বিপর্যয়জাত নব্য ধনিকশ্রেণীর উত্থান শ্রেণী-বৈষম্যকে ক'রে তোলে প্রকটিত। বিশ্ব-ব্যাপ্ত এই প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষেও হয় সংক্রামিত; সমকালীন প্রতিবাদী ও আপোষ-কামী রাজনৈতিক আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাবাজারের মন্দা ইত্যাদি ঘটনায় এই সংক্রমণ-প্রক্রিয়া হ'য়ে ওঠে সুপ্রত্যক্ষ। জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পে এই বিপর্যস্ত-সময়ের প্রতিফলন দুর্লক্ষ্য নয়। নতুন শ্রেণীর উত্থান এবং তৎপরবর্তী তার মুদ্রানিয়ন্ত্রিত আচরণ, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের অস্তিত্বসাধনা, অর্থলিপ্সু মানুষের বিকৃতি এবং অর্থপ্রাপ্তির ব্যর্থতাপ্রসূত উন্মাদনার চিত্র তাঁর গল্পে রূপায়িত হয়েছে। যদিও গল্পকার ঘটনাকে সমকালের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত করেননি, তবু এটা অস্পষ্ট থাকেনা যে, এ-সব চরিত্র সমাজমূলসংলগ্ন এবং দেশকাল-সাপেক্ষ। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহ এবং তাদের গতিবিধি, আচার-আচরণ, ভাবনা-অভিব্যক্তি অস্থির সমকালের সঙ্গে লৌহচুম্বকরূপে সংলগ্ন।

"পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক"[১০০] এবং "গুরুদয়ালের অপরাধ"[১০১] গল্প দু'টির পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন দুই সমাজকাঠামো; প্রথমোক্ত গল্পে সামন্তসমাজভুক্ত দরিদ্র মিহির প্রামাণিকের ক্ষুদ্র অলাভজনক ব্যবসায়-জীবন থেকে ঘটেছে উচ্চতর শ্রেণীতে উত্থান এবং শেষোক্ত গল্পে মধ্যবিত্ত-নিয়ন্ত্রিত শহুরে-জীবনে পর-মুখাপেক্ষী গুরুদয়াল দূর-উত্তরাধিকার-সূত্রে আকস্মিক অর্থলাভ ক'রে পেয়েছে উচ্চতর শ্রেণী-প্রতিনিধির মর্যাদা। মিহির প্রামাণিক আকস্মিকভাবে জমিদার জাহ্নবী দাশগুপ্তের পাইক-পদে নিয়োগ লাভ করে; পরিণামে গোবেচারা, নিরীহ, অলস, অসফল দোকানদার মিহির ধাতব চাপ-রাশ, জমিদার-রশ্মি বিকীর্ণ শিরস্ত্রাণ এবং "জমিদারের দুর্দান্ত শাসনশক্তির"

প্রতীক বাঁশের লাঠির বদৌলতে অর্জন করে গাম্ভীর্য,অহমিকা ; আদায় করে সম্ভ্রম ও মর্যাদা। জমিদারের "দুঃসহ ক্ষমতার" প্রতীকমূর্তি-রূপে "ভালো-মানুষ" মিহির লাভ করে শ্রী-শোভিত অভিধা—পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক। পক্ষান্তরে, গুরুদয়ালের আকস্মিক অর্থলাভই তার অপরাধের হেতু। কেননা বড়লোক চন্দ্রশেখর সান্যালের অনুগ্রহপুষ্ট সম্পদশূন্য-মোসাহেব যখন আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তির কারণে উচ্চতর শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করে তখন এতদিনকার প্রভুর কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে—এই অসূয়া-বহ্নিতে দগ্ধ হ'য়ে চন্দ্রশেখরের মনে হয়—"···তাঁহাকে যেন সহসা কেন্দ্রচ্যুত আর আশ্রয়ভ্রষ্ট নিরালম্ব করিয়া তাঁহার অধিকারের বাহিরে একটা স্থানে কেউ দাঁড় করাইয়া দিয়াছে···সেখানে তিনি অতিশয় ক্ষুদ্র।"[১০২] জগদীশ গুপ্তের অন্যান্য চরিত্রের মত গুরুদয়ালের এই দৈব-অপরাধ চন্দ্রশেখরের কাছে অকল্পনীয় ব'লেই ক্ষমাহীন ; মুদ্রা-প্রতিযোগী বিশ্বে উচ্চতর শ্রেণীপ্রতিষ্ঠা-কামী আগন্তুকের উত্থানে তাই ঈর্ষাতপ্ত-কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেন—"তবে আর এখানে কেন ? কেন এসেছো ? চ'লে যাও—আর এসো না।"[১০৩]

জগদীশ গুপ্তের কিছু কিছু ছোটগল্পে মুদ্রাসুখ কিম্বা সম্পদসুখ—কখনো পারমার্থিক নিরাসক্তিতে, কখনো কদর্য বিকৃতির ভূমিকায় প্রকাশিত। "সুলভ মৃত্যু"[১০৪] গল্পের গৃহিণী সর্বমঙ্গলা ধন-ধান্য, স্বামী-পুত্র-পুত্রবধূ পরিপূর্ণ সুখী জীবন যাপন ক'রেও উচ্চারণ করেন অভ্যাসে পরিণত বহু-মাত্রিক সংলাপ "মরণ হলে বাঁচি"। বৃদ্ধা ভিখারিণীকে ভিক্ষাপাত্রে দান করার মুহূর্তে অনেকবারের মত ঐ-সংলাপের পুনরুচ্চারণে মূর্ত হয়ে ওঠে তার বিকৃত সুখ কিম্বা সুখের অসুখ। "চার পয়সায় এক আনা"[১০৫] গল্পে সর্বহারা ভিক্ষুক-পরিবারের এক বালক খেলার সময় অকস্মাৎ এক আনার একটি অমূল্য মুদ্রা পাওয়ায়, পরিবারের ছোট-বড় প্রতিটি সদস্য মুদ্রাটিকে স্ব-অধিকৃত মনে ক'রে ঐটি ব্যয় করার সম্ভাব্য পরিকল্পনা ব্যক্ত করে। চার পয়সা মূল্যমানের এই একআনি মুদ্রা স্বভাবতঃই এই দরিদ্র ভিক্ষুক-পরিবারে রচনা করে পারিবারিক অশান্তি ; গল্পের পরিণামে দেখি ভিক্ষুক কাশীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশী যুগপৎ ঘৃণা ও নিরাসক্তির মধ্য দিয়ে পারিবারিক অশান্তিসূচক "দৈবদত্ত সুদর্শন আনিটা"-কে "বিকৃত ও অকর্মণ্য" ক'রে অন্ধকারের অনির্দেশ্য শূন্যে নিক্ষেপ করে। "অন্নদার অভিশাপে"[১০৬] গল্পে অদৃশ্য অন্নদাত্রী অন্নদার অভিশাপে দারিদ্র্য-পীড়িত, নিষ্কর্ম পরান্নজীবী

গুরু তার স্ত্রী অমলার আত্মমর্যাদালব্ধ ধিক্কারে অস্তিত্বজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয় এবং পরিশেষে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আত্মস্বাতন্ত্র্যকামী ও সম্মানজনক জীবনের প্রত্যাশায় কলকাতার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে। নিরাসক্ত ও নির্লিপ্ত বাক্য বিন্যাস ক'রে, গল্পের শেষে আকস্মিকভাবে গল্পকার এই সংবাদ পরিবেষণ করেন যে, "গুরুর নাম এখন এডওয়ার্ড রায়; মিশনারী স্কুলের সে শিক্ষক; বেতন পঁয়তাল্লিশ টাকা।"[১০৭] ধর্মান্তরের এই সংবাদ পরিবেষণে গল্পকার শিল্পী-সুলভ নির্বিকার ও স্বাভাবিক; তাঁর কাছে গুরুর অদৃষ্টতাড়িত জীবনে স্ব-ভাগ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামশীলতাই পেয়েছে প্রাধান্য। দৈব-রূপী অনির্দেশ্য অনুদার অভিশাপই গুরু-কে নিজ-ভাগ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুগিয়েছে প্রেরণা। জগদীশ গুপ্ত জানতেন জীবনের ভাগ্য রচনায় দৈব ব্যতীত মানুষেরও রয়েছে কার্যকর ভূমিকা; গুরু-চরিত্র তাঁর এই বিশ্বাসেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; পক্ষান্তরে "রাণী শান্তমণি"[১০৮] গল্পে সন্তানহীন অক্ষয়ের বাৎসল্য-রসাশ্রিত পশু-প্রীতি এবং যজ্ঞেশ্বর ও অনন্তের পরার্থ হস্তগত করার কূট-কৌশল চিত্রণের মাধ্যমে, যুগপৎভাবে মানুষের অর্থ-আসক্তির নগ্ন রূপটি প্রকাশ লাভ করেছে। অক্ষয় মৃত্যুর পূর্বে, পালিত প্রিয়-বিড়াল রাণী শান্তমণির লালন-পালনের দায়িত্ব এমন সুকৌশলে অর্পণ ক'রে যায়, যা'তে তার অবর্তমানে বিড়ালটির অনাদর না-হয়। অক্ষয়ের ব্যবস্থা ছিল এ-রকম—শান্তমণির জীবৎকাল তাঁর সম্পত্তির মালিক হবে তারই অনুজ অনন্ত; কিন্তু শান্তমণির মৃত্যুর পর সম্পত্তি ভোগ করবে ভায়রা-ভাই যজ্ঞেশ্বর এবং যজ্ঞেশ্বরের মৃত্যুর পর তার গৃহ সাধু-সন্ন্যাসীদের আস্তানা-রূপে ব্যবহৃত হবে। সম্পত্তি সংরক্ষণের এ-ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে কৌতুককর; কিন্তু অক্ষয়ের মৃত্যুর পর একই-সঙ্গে বিড়ালকে হত্যা করা ও সংরক্ষণ করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে দেখি অনন্ত ও যজ্ঞেশ্বর-কে; উভয়েরই উদ্দেশ্য পর-সম্পদ হস্তগত করা। যদিও গল্পের শেষে অসহায় বন্দী-জীবন ঘুচিয়ে রাণী শান্তমণি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। গল্পটিতে স্বার্থগত কারণে একটি জীবনকে যুগপৎ রক্ষা করা ও হত্যা করার এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় অর্থগৃধ্নু মানুষের প্রবৃত্তির জীবন্ত চিত্র-রূপ নির্মাণ করেছেন গল্পকার।

আমাদের শ্রেণীকরণকৃত এ-পর্যায়ের সর্ব-শেষ গল্প "এইবার লোকে ঠিক বলে—"[১০৯]। জননী ও স্ত্রী-কে নিয়ে শ্রমজীবী শিবপ্রিয়র প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখময় জীবনে অশান্তি ছিলনা; কিন্তু সুবর্ণ-মারীচের প্রত্যাশায় গৃহত্যাগী

শিবপ্রিয় ব্যর্থতায় বেদনায় পরিশেষে বায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছে। আকস্মিক-ভাবে তাদের গ্রামে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে; সন্ন্যাসী অলৌকিক সম্মোহনশক্তির সাহায্যে স্বর্ণ তৈরী ক'রে গ্রামবাসীদের হতবাক্ ক'রে দেন, ফলে আহারে-আপ্যায়নে, ভৃত্য-ভক্ত-অনুচরে তাঁর আস্তানা পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। দারিদ্র্য-পীড়িত শিবপ্রিয় একদিন সেই সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে আনত হ'য়ে স্বর্ণ তৈরীর সেই অলৌকিক পদ্ধতি শিখিয়ে দেবার জন্য আবেদন জানায়। সন্ন্যাসী শিবপ্রিয়কে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন এবং শর্তা-রোপ করেন যে,—শিবপ্রিয় যদি ছয়মাস তাঁর সঙ্গে অবস্থান করে, তবেই তিনি তাকে স্বর্ণ তৈরীর গুপ্ত-রহস্য শিখিয়ে দেবেন। গ্রাম্য-সরল শিবপ্রিয় এতে রাজী হয় এবং গৃহত্যাগ করে। ছয়মাস পর নির্দিষ্ট দিনে মুচ্ছাভঙ্গের পর শিবপ্রিয় আবিষ্কার করে সে একাকী—সন্ন্যাসী পলাতক; এবং গৃহ থেকে নিয়ে আসা তাঁর ব্যক্তিগত পুঁজি অপহৃত। সুবর্ণ-লোভের সূত্রে শিবপ্রিয়র জীবনে অদৃষ্টের আবির্ভাব—পরিণামে সে হয় উন্মাদ এবং উচ্চারণ করে "চুন চুন স এ হমারে মরী ঐ" ('বাছিয়া বাছিয়া আমার শত্রু নিপাত ক'র)। তার এই আর্তচিৎকারের কারণে জনতা তাকে অভিহিত করে 'পাগল' ব'লে, গল্পকার লিখেছেন যে,"—এইবার লোকে ঠিক বলে"। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পরশপাথর" (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) কবিতার আখ্যান-অংশের সঙ্গে গল্পটির আংশিক সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তবে, পার্থক্য এই, শিবপ্রিয় জগদীশ গুপ্তের অন্যান্য চরিত্রের মতই সুখসন্ধানী অর্থলিপ্সু; শ্রেণী-অবস্থানের অলৌকিক পরিবর্তন তার কাম্য। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব-শাসিত ক্ষ্যাপা পরশ-পাথরের অজানিত প্রাপ্তির পর তা' হারিয়েছিল এবং পুনরায় অনন্ত অনুসন্ধানে তার জীবন-যাত্রা। কিন্তু বিভ্রান্ত শিবপ্রিয় স্বর্ণ-মারীচের পশ্চাদানুসরণ করেছে—লীলা-চপল অদৃষ্ট গগনচুম্বী প্রত্যাশার ছিদ্র-পথে প্রবেশ করেছে শিবপ্রিয়র জীবনে এবং নষ্ট করেছে তার নিরাপদ গৃহসুখ, বিনাশ করেছে মানসিক শৃঙ্খলা। জগদীশ গুপ্ত অবশ্য এই বিতর্কিত গল্প প্রসঙ্গে নিজ-মত ব্যক্ত করতে গিয়ে শিবপ্রিয়র পরিণতির জন্য গ্রামবাসীর নির্বুদ্ধিতা, দারিদ্র্য এবং দৈব বা নিয়তির অনুশাসনকে দায়ী করেছেন।[১১০]

জগদীশ গুপ্তের এ-পর্যায়ের গল্প-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহ অদৃষ্টতাড়িত ঘটনাজালে হয়েছে আবদ্ধ; অর্থ-তৃষ্ণা,

সম্পদ-সুখ, শ্রেণী-উত্থান এবং সুখের বিকৃতিতে তাদের পরিণতি যুগ্মভাবে অসুস্থ, অসঙ্গত ও করুণ। এই অসঙ্গতির পঙ্ক-প্রবাহে আর্ত-মানুষের বিনষ্টির চিৎকার জগদীশ গুপ্তের সহানুভূতি ও সংবেদনবেদ্য চিত্তের সংস্পর্শে হয়ে উঠেছে প্রাণস্পন্দনময়। এই বিনষ্টির ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে ক্বচিৎ অঙ্কুরিত মানব-বৃক্ষের অভ্যুদয়ে, ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে জগদীশ গুপ্তের বিপন্ন দেশকাল-সাপেক্ষ অন্তর্গত মানবজিজ্ঞাসা ও মানবত্ববোধ।

৩ ঙ

জগদীশ গুপ্তের অতি-প্রাকৃত গল্পে অদৃষ্টতাড়িত গল্পের মতই স্বাভাবিক কার্যকারণশৃঙ্খলা বিঘ্নিত; অতি-প্রাকৃত ঘটনা-সংঘটনে গল্পান্তর্গত চরিত্র-সমূহ নিশ্চেষ্ট, নিরুপায় ও মোহাবিষ্ট। "ভূষিত আত্মা"[১১১] গল্পের পরিচর্যা-বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ"—এর (শ্রাবণ ১৩০২) অনুপ্রেরণা হয়ত ক্রিয়াশীল। যদিও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যজনিত কারণে রবীন্দ্রনাথের গল্পটি প্রাণবন্ত ও দূরসঞ্চারী রূপকার্থে সমৃদ্ধ। "দৈবধন"[১১২] গল্পেও যুক্তিহীন বিশ্বাসের সূত্রে জন্মান্তরলব্ধ মানুষের পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কায় ত্রাস ও শঙ্কাতাড়িত পাঠক হয়ে ওঠে ভীত-বিহ্বল। যদিও গল্পের শেষে দৈব-বিশ্বাসের বদৌলতেই অনির্দেশ্য অথচ আহ্বান-করা মৃত-ব্যক্তি গল্পের ঘটনা-মঞ্চে প্রবেশের পূর্বেই প্রত্যাখাত হ'য়ে ফিরে যায়।

জগদীশ গুপ্তের লঘু-রসের গল্পে হাস্য-কৌতুকের অন্তরালে জীবনের দুঃখময়তা ("পেয়িং গেস্ট"), যাপিত-জীবনের প্রত্যহিকতাজাত একঘেয়েমি থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা ("আঠারো কলার একটি") ইত্যাদি অর্জন করেছে প্রাধান্য। 'উদয়লেখা' গল্পগ্রন্থের "কামাখ্যার কর্মদোষে—" এবং ব্যস্ত-বাগীশ" গল্প দু'টি নির্মল কৌতুক-রসাশ্রিত। শেষোক্ত গল্পে চরিত্রের একক সংলাপ-ভিত্তিক সংগঠন সৌষ্ঠব গল্পকারের আঙ্গিক নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নবতর সংযোজন।

৩ চ

জগদীশ গুপ্তের গল্পের আখ্যানভাগ ও তার চরিত্রসমূহ প্রায়শঃই প্রচলিত ও স্বাভাবিক জীবন থেকে দূরবর্তী; জীবনের এই অসঙ্গতি, যা সমাজমূল-উত্থিত ব'লেই বাস্তবিক—তাকেই শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করেছেন গল্পকার।

তাঁর নর-নারী সমাজ-অন্তর্গত হ'য়েও প্রচলিত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ; এই বিচ্ছিন্নতা ও নৈঃসঙ্গ্য অর্থলিপ্সায় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় অধিকাংশ চরিত্রকে করেছে প্রমত্ত। এবং তাদের আসক্তি-উন্মাদ কদর্য-জীবনাচারে ইন্ধন যুগিয়েছে তাদের অদৃষ্টবাদী জীবনবোধ। আরো স্পষ্ট ক'রে বলা যায়, তাদের বিশ্বাস ও আচরণ, এই দুই উপাদান পরস্পরিত হ'য়ে সংগঠিত হয়েছে তাদের সামগ্রিক জীবন-দৃষ্টি। অদৃষ্টবাদী মানুষ অনিবার্যভাবে হয়ে ওঠে স্বৈরাচারী একনায়ক। কিন্তু এ-সব চরিত্র অসংগঠিত, অল্প-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব'লেই শক্তিমানের ক্ষমতা-ঐশ্বর্য অর্জন করতে পারে না—তারা অভিহিত হয় খল-নায়ক হিসেবে। নবযুগ-উত্থিত এই ভাঙন কিম্বা বিচ্ছিন্নতার অনিবার্যতা জগদীশ গুপ্তের শিল্পীচৈতন্যে কথা-সাহিত্যিক-জীবনের সূচনাকালেই জাগ্রত হয়েছিল। কেননা, "ভরা সুখে" গল্পে এই বিচ্ছিন্নতার ইঙ্গিত প্রথম পরিস্ফুট হতে দেখি। পরবর্তীকালে রচিত গল্পে এমন অনেক চরিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি—যারা এক-একজন এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ; জনশূন্য সেই হৃদয়-দ্বীপে তারা সম্রাট কিম্বা সম্রাজ্ঞী; স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীন। "ভরা সুখে" গল্পে এই অনিবার্য বিচ্ছিন্নতার প্রথম পর্যায়টি ইঙ্গিতস্পর্শী বাক্যসংযোজনার সাহায্যে অভিব্যক্তি পেয়েছে। গল্পটির আখ্যান গৃহীত হয়েছে একটি সুখী মাতৃতান্ত্রিক পরিবার থেকে; যেখানে রত্নগর্ভা হরিমোহিনীর নির্দেশ-আদেশ-ইচ্ছা বিযুক্ত কোন ঘটনা সংঘটিত হয় না।

> মায়ের হাতে টাকা নাই তবু ছেলেরা মাতৃভক্ত। অন্নপ্রাশন হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গোৎসব পর্যন্ত ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো ব্যাপার হরিমোহিনীর অমতে বা অনিচ্ছায় আজ পর্যন্ত একটিও সাধিত হয় নাই। বৌরাও তেমনি—মা বলিতে অজ্ঞান। ছ'টি ছেলের ছয় ছক্ ছত্রিশটি অর্থাৎ বহুসংখ্যক ছেলেমেয়ে লইয়া গাঙ্গুলীদের প্রকাণ্ড সংসার—সবার উপরে মা। অপার (sic) করুণা, অনন্ত শ্রী, অসীম ধৈর্য, অতুল আনন্দ, অজস্র কল্যাণ লইয়া মা মাথার উপরে বিরাজ করিতেছেন—অনুগত ভৃত্যের মত সংসার তাঁর আজ্ঞাবহ!···১১৩

এই জননী হরিমোহিনীর দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর তার অন্নপথ্য-গ্রহণ উপলক্ষে গৃহে মহাসমারোহে আয়োজন করা হয় ভোজন-উৎসবের। আধ

ঘণ্টা ধ'রে সিদ্ধকরা এক তোলা চালের সঙ্গে এক তোলা দুধের সংমিশ্রণে উৎপন্ন তরল পথ্যই তার আহার্য——"এই হইবে মায়ের অনুপথ্য, কিন্তু আয়োজন হইয়াছে একটা যজ্ঞের।" কিন্তু পথ্য-গ্রহণের পূর্বেই পারিবারিক সংহতির সুদৃঢ় বন্ধন প্রত্যক্ষ ক'রে "হারিমোহিনী সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্লান্তিভরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।" তার এই শান্তশ্রী মৃত্যুর নিরাসক্ত দৃশ্যপট উপস্থাপনের সঙ্গে-সঙ্গেই গল্পেরও ঘটেছে সমাপ্তি। কিন্তু একানুবর্তী-পরিবারের যে-সংহতি, ঐক্য এবং সম্মিলনের আনন্দ প্রত্যক্ষ ক'রে হরিমোহিনীর মৃত্যু হল ইঙ্গিত-গর্ভ ক্ষুদ্র দুই বাক্যের সাহায্যে পূর্বেই গল্পকার ঐ ঐক্য ও সংহতির অবশ্যম্ভাবী ভাঙনকে কৌশলে ব্যক্ত করেছেন। "মা এত খাইবেন না—রাঁধিয়া শুধু তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে দিবার আনন্দের লোভে একটি বেলার জন্য পরস্পর পৃথক হইয়া গেছে"—মৃত্যুর পূর্বেই, হরিমোহিনীর অগোচরে একানুবর্তী পরিবারের অমোঘ বিচ্ছিন্নতার বীজ উপ্ত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, মায়ের মুখে কে পথ্য তু'লে দেবে——এ-প্রশ্নেও "অনেক মান, অভিমান, কান্নাকাটি, রেষারেষি, ইচ্ছা, আবদার নালিশ, সালিশের পর" যাকে এ-দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে এ-সংসারের অতিথি,—হরিমোহিনীরই বিবাহিতা-কন্যা নিপুণা। গল্পের শুরুতেই বলা হয়েছে, ছয় পুত্রের অতিরিক্ত এই কন্যাকে "রত্ন জ্ঞান" ক'রে হরিমোহিনী "নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেন না"। বস্তুতঃ হরিমোহিনী মাতৃ-প্রধান একানুবর্তী-পরিবারের সর্বশেষ প্রতিনিধি ; পরিবারের অটুট সংহতি দর্শন ক'রে হয়েছে তার জীবনাবসান ; কিন্তু অগোচরে তার জীবদ্দশাতেই ঘটেছে এর ব্যত্যয়। যুদ্ধোত্তর যুগচৈতন্যের সরণি-ধ'রে অনুপ্রবেশ করেছে জীবনের যে জটিলতা, যার অনিবার্য প্রতিফল বিচ্ছিন্নতা—একানুবর্তী পরিবারের এই বিচ্ছিন্নতার সঙ্কেত ব্যক্ত ক'রে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশকামী এই আধুনিক জীবন-চৈতন্যকে তিনি তাঁর এই ছোটগল্পে প্রথম ধারণ করেছেন। হরিমোহিনীর ভরা-সুখে মৃত্যুতে বাঙময় ও তীর্যক হয়ে উঠেছে সুখ-সংহত পরিবারের অত্যাসন্ন বিভক্তি। এবং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অতিথি-হস্তক্ষেপ কিম্বা ডিপ্লোম্যাট মিশনের মতই পরিবার সদস্যদের পরস্পর-বিরোধিতার ছিদ্রপথে, 'ফর্মূলা'র মত আহুত হ'য়ে সমস্যার মীমাংসায় ঘটে নিপুণার অনুপ্রবেশ।

৪

জগদীশ গুপ্তের জীবন-দর্শন ও গল্পালোচনা সূত্রে আমরা এই প্রত্যয়ই প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছি যে, তাঁর শিল্পীচৈতন্যবৃক্ষ দেশকালসংলগ্ন মৃত্তিকায় রোপিত-অঙ্কুরিত-বর্ধিত। তাঁর জীবনদৃষ্টির দ্বিধা যুগধর্মেরই অকপট প্রতিচ্ছবি। ফলতঃ তাঁর চরিত্রসমূহ অদৃষ্টবাদী ব'লেই স্বেচ্ছাচারী, অর্থলিপ্সু নরঘাতক, প্রচলিত সমাজ-প্রকৃতির বিশৃঙ্খলায় তৎপর। জীবনে-সমাজে অনুপ্রবিষ্ট এই বাস্তবতা সমকাললগ্ন এবং ইতিহাসেরই ক্রমবিকাশের এক বিশিষ্ট পর্যায়। জগদীশ গুপ্ত বাস্তবপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজের দ্বিধা এবং তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ মানুষের জীবনবোধের রসায়নে নির্মাণ করেছেন যে শিল্পলোক, তা' মানব-ইতিহাসের একটি অসুস্থ-অস্থির সময়েরই অকপট অভিজ্ঞান। আশার কথা, জগদীশ গুপ্ত মানবতা-সুপ্ত এই অসুস্থ সময়ের পঙ্ক-সরোবরে আপাদমস্তক নিমজ্জিত হননি; আবক্ষ মূর্তির মত তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত; অনাগত সুস্থির ইতিহাসের আগমন-প্রতীক্ষায় তিনি উৎকণ্ঠিত। কেননা সুপ্ত-মানবতার বীভৎস কদর্য অসঙ্গতির শিল্পরূপকার হয়েও তাঁর রচনায় মানুষের জীবনসাধনা, মানবত্ব, সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ঔদার্য ও সংগ্রামস্পৃহা ইঙ্গিত-নৈপুণ্যে হয়ে উঠছে চিত্ররূপময়। জগদীশ গুপ্ত মনুষ্যত্বহীনতার রূপদর্শী মাত্র, সুপ্ত-মানবতার পূজারী নন; মানুষের মানবিক অভ্যুদয়ে তাঁর প্রশান্তি।

তথ্যনির্দেশ

১ সাহিত্য-জগতে জগদীশ গুপ্তের আবির্ভাব ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর প্রথম রচনা ''মির্জার স্বপ্নদর্শন'' 'ভারতী' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ বিলম্বিত হয়েছে; তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'পেয়িংগেস্ট' ['উদয়লেখা' (১৩৩৯) গ্রন্থে সঙ্কলিত] ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'বিজলী'তে প্রকাশ লাভ করে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লঘু-গুরু'র প্রকাশকাল ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

২ দ্র. সুকুমার সেন; 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (চতুর্থখণ্ড), চতুর্থ সং ১৯৭৬, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃ. ২৫৯

৩ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ; 'কল্লোল যুগ', তৃতীয় প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬০, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা, পৃ. ২৬০

৪ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'জগদীশচন্দ্র গুপ্তের স্ব-নির্বাচিত গল্প' [প্রথম সং ৭ই ভাদ্র, ১৮৮১ শকাব্দ, (১৯৫৯ খ্রী.), ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা] গ্রন্থের ভূমিকায় জগদীশচন্দ্র অচিন্ত্যকুমার-উত্থাপিত "অনুপস্থিত" অভিধার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ মন্তব্য উপস্থাপন করেন :

"শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যবাবু ১৩৫৬ / অগ্রহায়ণের পূর্বাশায় প্রকাশিত "কল্লোল-যুগ" প্রবন্ধে একটি অকপট সত্য অতি সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। জগদীশবাবু সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণশীল অনেকের কাছেই "অনুপস্থিত" এই একটি শব্দ, "অনুপস্থিত" শব্দটি, আমার সঙ্গে পাঠকের যোগরেখা চমৎকার নির্বিশেষ ভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। একটি শব্দের দ্বারা এতটা সত্যের উদ্‌ঘাটন আমার পক্ষে ভয়াবহ হইলেও আনন্দপ্রদ। সরল ভাষায় কথাটার অর্থ এ-ই যে, অনেকেই আমার নাম শোনেন নাই। কাজেই অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, যাহাদের কাছে আমি "অনুপস্থিত" তাঁহাদের সম্মুখে, "এই নিন্ আমার জন্মতারিখ আর বইয়ের লিস্ট" বলিয়া আচম্‌কা লাফাইয়া পড়িতে আমি পারি না। লেখা পড়াইয়া সন্তোষ বিধান ব্যতীত নিজের খবর আর তথ্য জানাইয়া তাঁদের কৃতার্থ করিবার দায়িত্ব আমার নাই।"

দ্র. 'জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড), সম্পাদক : নিরঞ্জন চক্রবর্তী, সহযোগী সম্পাদক : শুভেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিশেষ সংস্করণ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮২, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃ. ৬৪৬ (উদ্ধৃত)

৫ বুদ্ধদেব বসু ; "রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক" : 'সাহিত্যচর্চা', প্র. সং বৈশাখ ১৩৬১, সিগনেট প্রেস, কলিকাতা, পৃ. ১৪৭

৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "পুরাতন ভৃত্য" (১২ ফাল্গুন, ১৩০১) শীর্ষক কবিতায় প্রতিষ্ঠা করেছেন মানবিক মহিমার ঐশ্বর্য। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্যের ধারণা জগদীশ গুপ্তের গল্পে বিপর্যস্ত

হয়েছে। তাঁর 'পুরাতন ভৃত্য' গল্পে মানবিক বিশ্বাস হয়েছে লাঞ্ছিত। কিন্তু একে প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত রচনা বা রবীন্দ্র-বিরোধিতা বলা চলে না। জগদীশ গুপ্তের অধিকাংশ গল্পেই মানবিক অবিশ্বাস ও অসঙ্গতি বিদ্যমান।

৭ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

৮ দ্র. "গল্প কেন লিখিলাম"—শীর্ষক 'বিনোদিনী' (১৩৩৪) গল্প-গ্রন্থের ভূমিকা, জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৫-৩৬

৯ মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি. এ. বার-অ্যাট ল সম্পাদিত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকার ২০ বর্ষ, ১ খণ্ড, ৬ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়। দ্র. সুবীর রায়চৌধুরী; 'জগদীশ গুপ্তর গল্প', প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ১৯৭৭, অয়ন, কলিকাতা, পৃ. ২০২ (উদ্ধৃত)

১০ অনিলবরণ রায়; "আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ" ('বিচিত্রা', ৩ বর্ষ, ১ খণ্ড, ৩ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক: উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়), উদ্ধৃত, 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (প্র. সং), পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪, ২১৮, ২২১

১১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাংশ: অনিলবরণ রায়, পূর্বোক্ত, উদ্ধৃত, পৃ. ২২২

এতদ্ব্যতীত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'লঘু-গুরু' উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যিক-প্রবণতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র নির্দেশ করেছেন। তাঁর ভাষায়:

"লঘু-গুরু গল্প সম্বন্ধে যদি জজিয়তি করতেই হয়, তা হলে গোড়া-তেই আমাকে কবুল করতে হবে যে, এই উপন্যাসে যে লোকযাত্রার বর্ণনা আছে, আমি একেবারেই তার কিছু জানিনে। সেটা যদি আমারই ত্রুটি হয়, তবু আমি নাচার। বলে রাখছি, এ-দেশে লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে কাটালুম, এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত-সমুদ্র-পারের বিদেশ বললেই হয়। দূর থেকেও আমার চোখে পড়েনা। লেখক নিজেও হয়তো বা অনতিপরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও-জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন।

আমার এই সন্দেহের কারণ হচ্ছে এই যে, লেখক আমাদের কাছে তাঁর বক্তব্য দাখিল করেছেন, কিন্তু, তার যথেষ্ট সমর্থনের যোগাড় করতে পারেননি। যেটা দেখাতে চেয়েছেন, তিনি নিজে তার সবটাই যে দেখেছেন এমন লক্ষণ অন্ততঃ লেখা থেকে পাওয়া যাচ্ছেনা।... যাই হোক্, এ কথা মানতে হবে, রচনা-নৈপুণ্য লেখকের আছে। আধুনিক আসরে রিয়ালিজ্‌মের পালা সস্তায় জমাবার প্রলোভন যদি তাঁকে পেয়ে বসে, তবে তাঁর ক্ষতি হবে। সাহিত্যের শ্রীক্ষেত্রে বাস্তব-প্রবণতা বা ভাবপ্রবণতা নিয়ে জাতিভেদের মামলা তোলা প্রায় আধুনিক কম্যুনালিজ্‌মের মতোই দাঁড়িয়েছে। অথচ, সাহিত্যে ওর মধ্যে কোনটারই জাতিগত বিশেষ মর্যাদা নেই। সাহিত্যে সম্মানের অধিকার বহির্নির্দিষ্ট শ্রেণী নিয়ে নয়, অন্তর্নিহিত চরিত্র নিয়ে।...

একটা কথা বলা উচিত, প্রসঙ্গক্রমে রিয়ালিজ্‌ম নিয়ে যে কথাটা উঠে পড়ল, তার সমস্তটা "লঘু-গুরু" বইটি সম্বন্ধে খাটেনা। এই উপাখ্যানের বিষয়টি সামাজিক কলুষঘটিত বটে, তবুও কলুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার উৎসাহ এর মধ্যে নেই। পূর্বেই বলেছি যে, গল্পের চেহারাটি নিঃসন্দিগ্ধ সত্যের মতো দেখাচ্ছে না, এইটেতেই আমার আপত্তি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ('পরিচয়', কার্তিক ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) দ্র. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৭-৪০

১২ মোহিতলাল মজুমদার; "বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য": 'সাহিত্য বিতান', প্র. প্র. ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, পৃ. ২৭৯

১৩ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (মুখবন্ধ: 'রোমান্থন'; জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩৩৭)
উদ্ধৃত, 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (১ম সং), পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯-১০

১৪ সুকুমার সেন; পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪১

১৫ অশোক গুহ ('পরিচয়', ২৭ বর্ষ, ২-৩ সংখ্যা, ১৯৫৭, সম্পাদক: গোপাল হালদার, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)
'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (১ম সং), পূর্বোক্ত, উদ্ধৃত, পৃ. ২২৬

১৬ সুবীর রায়চৌধুরী ; ''জগদীশ গুপ্ত'' : 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং ১৯৮৩), দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, দ্র. পরিশিষ্ট, পৃ. দুই, চার, ছয়

১৭ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ; 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৭১, সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা, পৃ. ২৭৫

১৮ অশ্রুকুমার সিকদার ; '' 'মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর' জগদীশ গুপ্ত'', 'জলার্ক', জগদীশ গুপ্ত সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৮৮–চৈত্র ১৩৮৮, কলিকাতা, সম্পাদক : মানব চক্রবর্তী, স্বপন দাসাধিকারী, পৃ. ১, ২, ১৬

১৯ ভূদেব চৌধুরী ; 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', প্র. সং ১৯৬২, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা
''জগদীশ গুপ্তও অবিশ্বাসী ;—তাহলেও বিশ্বাসহীন নন তিনি। অর্থাৎ সৌন্দর্য, কল্যাণ ও সত্য সম্পর্কে মানুষের যুগ-যুগ প্রচলিত-নীতি-চেতনার প্রতি এক মৌলিক অবিশ্বাসে জগদীশ গুপ্ত একান্ত বিমুখ। এই বিমুখতা তাঁর দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। ফলে, জীবন-সম্পর্কিত সকল নীতি-বোধ ও কল্যাণমূলক মূল্যমানকে কেবল অস্বীকার করেই তিনি তৃপ্ত নন,—বিশ্ব-প্রবাহের মূলে এক অমোঘ শক্তির অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেছেন,—যা একান্ত-রূপে বিনাশক,—ক্রূর এবং কদর্য।'' পৃ. ৫৩০

২০ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ; 'কালের পুত্তলিকা' (বাংলা ছোটগল্পের নব্বুই বছর : ১৮৯১-১৯৮০), প্র. প্র. আশ্বিন ১৩৮৯, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা
''নির্মম, তিক্ত, মানুষ সম্পর্কে নৈরাশ্যগ্রস্ত লেখক জগদীশ গুপ্ত। মানব-জীবনের নিষ্ফলতা ও ব্যর্থতার আড়ালে এক ক্রূর রহস্যময় শক্তির নিগূঢ় প্রভাব সম্পর্কে লেখক সদা-সচেতন।'' পৃ. ৪২৪

২১ হীরেন চট্টোপাধ্যায় ; 'বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত', প্র. প্র. ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা
দ্র. ''জগদীশ গুপ্ত ও তাঁর বাস্তববাদী মানসিকতা'' (চতুর্থ অধ্যায়), পৃ. ১০৪-২১

২২ জগদীশচন্দ্র গুপ্ত ; 'দুলালের দোলা', জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

"উত্তর যা মনে আসিল তাহার জন্য দায়ী, আমাদের নাড়ীনক্ষত্র বুঝিতে পারিয়া যাঁরা নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া গেছেন, তাঁরাই অর্থাৎ "বিবিক্ত আসনোভবেৎ"—মাতা, সহোদরা এবং পুত্রীর সঙ্গেও একাসনে উপবিষ্ট হইবে না। এই নিষেধ যাঁরা করিয়াছিলেন, তারা ফ্রয়েডের অগ্রজ ছিলেন, ইহা বুক ঠুকিয়া বলা যায়।" (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নীরদবরণের মন্তব্য)

২৩ জগদীশচন্দ্র গুপ্ত ; "শঙ্কিতা অভয়া" : 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং), পূর্বোক্ত

—'তুমি শুনছো কী তবে! ঐ "প্লেটোনিক লাভ"। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হবে, অথচ স্ত্রী-পুরুষের নিবিড়তম সম্পর্ক স্থাপিত হবে যাতে তা আদৌ ঘটবে না—তা কি হয়?' (শান্তিময়ীর উক্তি, পৃ. ৯৩)

'—মেকলে, থ্যাকারে আর এ্যাডিসনের ইংরেজী ভালো নয়, সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ ; শেক্সপিয়রের এতো পাঠান্তর আর এতো নিজস্বতা যে, বাঙালির পক্ষে তা বুঝিয়া ওঠা অসম্ভব,···

—'তবে তুই চাস কী? প্লেটোনিক লাভের বই?'

—'আমি চাই সরল আনন্দ। ডিকেন্স আমি খুব পড়ি।' (শান্তিময়ী-অতুল কথোপকথন, পৃ. ১০০-০১)

২৪ দ্র. তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থপরিচয় : 'জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী' (১ম খণ্ড), পৃ. ৬২৯-৫৫, পূর্বোক্ত ; গ্রন্থপঞ্জি ও পরিশিষ্ট : 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং), পৃ. ১৯৩-২০৬, এক-কুড়ি ; জগদীশ গুপ্ত : প্রাসঙ্গিক তথ্য : 'জলার্ক', জগদীশ গুপ্ত সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫-১০০

২৫ 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাস ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হলেও এর আদি-রূপ "কলঙ্কিত সম্পর্ক" ['শ্রীমতী' (১৩৩৭) গ্রন্থে "আহুতি" শিরোনামা-যুক্ত] ও "নিরুপম তীর্থ" ('স্ব-নির্বাচিত গল্পে' অন্তর্ভুক্ত) শীর্ষক ভিন্ন দু'টি গল্প। এ-দুয়ের সমন্বিত উপন্যাস-প্রয়াস 'কলঙ্কিত তীর্থ'।

২৬ উদ্ধৃত ; 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং), পূর্বোক্ত, পৃ. পরিশিষ্ট-সাত-আট

২৭ "আমার "লঘু-গুরু" বইখানি সম্বন্ধে 'জজিয়তি' করিতে বসিয়া বিভিন্ন জনগণ যে রায় দিয়াছেন তাহার মধ্যে পরিচয়ে প্রকাশিত রায়টিই প্রধান—কারণ, তাহার ঘোষক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ; এবং দ্বিতীয় কারণ বিচার্য্য বিষয় ছাড়িয়া তাহা বিপথগামী হইয়াছে, অর্থাৎ আসামীকে ত্যাগ করিয়া তাই আসামীর নির্দ্দোষ জনককে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু আপীল নাই।

পুস্তক পরিচয়ের শেষ অংশের চেহারাটাকে তার অভদ্র হুলের দরুণ নিঃসন্দিগ্ধ পুস্তক পরিচয়ের মত দেখাইতেছে না—ইহাতেই আমার আপত্তি। "অনতিপরিচিত" এবং "জায়গা" শব্দ দুটি অত্যন্ত রিয়া-লিস্টিক সন্দেহ নাই—কারণ···"বিশ্বম্ভর খেয়া পার হবার সময় উত্তম নামধারিণী এক বেশ্যাকে দেখে (sic) মুগ্ধ হোল।" "লোকা-লয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল" আমাকে কাটাইতে হইয়াছে সেখানে "স্বভাবসিদ্ধ ইতর" এবং "কোমর বাঁধা সয়তান" নিশ্চয়ই আছে, এবং বোলপুরের টাউন প্ল্যানিং-এর দোষে যাতায়াতের সময় উঁকি মারিতে হয় নাই, "ও-জায়গা" আপনি চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি আমার আপত্তি এই যে পুস্তকের পরিচয় দিতে বসিয়া লেখকের জীবন-কথা না তুলিলেই ভাল হইত, কারণ উহা সমালোচকের "অবশ্য-দায়িত্বের বাইরে" এবং তাহার "সুস্পষ্ট প্রমাণ" ছিল না···" উদ্ধৃত, 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং), পরিশিষ্ট—"জগদীশ গুপ্ত", পৃ. এগারো-বারো

২৮ জগদীশ গুপ্তের পত্রাবলী : ১ ('কালি-কলম' সম্পাদক মুরলীধর বসু-কে লিখিত), 'জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০২

২৯ জগদীশ গুপ্তের পত্রাবলী : ২৭, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২০

৩০ জগদীশ গুপ্তের পত্রাবলী : ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৩

"আমার অভ্যাস এই যে, আমি কাঁচা লিখিয়ে বলিয়া গল্প ফেরৎ পাইলে আমি তাদের অক্ষম স্থানগুলি সাধ্যমত খুঁজিয়া গল্পটি পুন-র্বার লিখি। "তৃষিত আত্মা" গল্পটিও পুনর্বার সংশোধন করিয়া লিখিয়া অন্য পত্রিকায় দিলাম। সেখান হইতেও নিশ্চয়ই সেটা ফেরৎ আসিবে, এবং তখন আবার ঝালাইব।"

৩১ দ্র. জগদীশ গুপ্তের পত্রাবলী : ১-৩৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০২-২৫

৩২ জগদীশ গুপ্তের পত্রাবলী : ২৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৭

৩৩ জগদীশ গুপ্তের পত্রাবলী : ২৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৭

৩৪ জগদীশ গুপ্তের পত্রাবলী : ৫, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৫

৩৫ জগদীশ গুপ্তের পত্রাবলী : ৩২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৫

৩৬ 'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ' উপন্যাসের রচনাকাল ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত। 'উপন্যাস পঞ্চক' নামে বিভিন্ন উপন্যাসের একটি সঙ্কলন-গ্রন্থে এটি প্রথম মুদ্রিত হয়। "শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র 'আজকাল' পত্রিকার (৪ এপ্রিল, '৮২) প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন : "মিত্র ও ঘোষ কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস হল "উপন্যাস পঞ্চক"। পাঁচটি উপন্যাসের একত্রিত একটি খণ্ড। ঐ পাঁচজন লেখকের নাম সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী, আশালতা দেবী এবং জগদীশ গুপ্ত।"

'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং), পূর্বোক্ত, উদ্ধৃত, পৃ. ২০৫

৩৭ 'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ'; পরিচ্ছেদ : দুই; জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮

৩৮ বন্ধু নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে পোস্টকার্ডে লেখা জগদীশ গুপ্তের কবিতা ("জগদীশ গুপ্ত"; শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, "চতুষ্কোণ" আশ্বিন, ১৩৮৪)।

উদ্ধৃত, জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৩

৩৯ "চারুবালা দেবীর (জগদীশ গুপ্তের স্ত্রী) একটি চিরকুট হতে জানা যায় : '১৯৫০ সনে স্বামীর বিনা অনুমতিতে পিতৃদত্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যাদবপুর সন্নিকট রামগড় কলোনীতে রিফিউজি হিসাবে জবরদস্তি জমিতে বাড়ি করি। কলোনীর প্রেসিডেন্ট প্রভৃতিকে ৪৫.০০ দিতে হয়। ঘর তোলা প্রভৃতি বাবদ খরচ আলাদা। রামগড়ে যাইবার পর দেখা গেল স্বামী খুব খুশী'।..."

তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ-পরিচয়, জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩০

৪০ জগদীশ গুপ্তের পত্রাবলী : ২৯, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২২

"রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেশবাবু [নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৮৮২-১৯৬৪] ঝগড়া করিয়াছেন এবং সেইজন্যই (নরেশবাবু লিখিয়াছেন) তিনি মন ভাঙ্গিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া আছেন। রবীন্দ্রনাথ নরেশ-বাবুর প্রতি অবিচার এবং অকারণে রোষ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু, তাই বলিয়া নরেশবাবু লেখা ছাড়িয়া দিবেন কেন, তাহা বুঝিলাম না। তাহা হইলে ত' আমাদের আর কোন কুলই থাকে না। আমাদের ত কোনো encouragement-ই নাই। নরেশবাবু জনপ্রিয় হইয়াও এক রবীন্দ্রনাথের ভ্রূকুটিতেই হতাশ হইয়া পড়িবেন, ইহা আমাদের তরফ হইতেই প্রতিবাদের বিষয়। তাঁহাকে বলিবেন।"

৪১ জগদীশ গুপ্তের পত্রাবলী : ৫, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৬
"এখন Ink Manufacture-এর কাজটা পুনরুজ্জীবিত করিব, স্থির করিয়াছি। "Jago's Ink."

৪২ জগদীশ গুপ্তের পত্রাবলী : ১৯, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৫

৪৩ "মারে কেষ্ট রাখে কে!" : 'উদয়লেখা', জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৪-১৫

৪৪ অশোক গুহ, পূর্বোক্ত, (উদ্ধৃত) পৃ. ২২৬

৪৫ জগদীশ গুপ্তের সমগ্র রচনাবলী এখনো একত্র গ্রথিত হয়নি। মুদ্রিত রচনার দুষ্প্রাপ্যতার কারণে 'জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড) এবং তাঁর একটি বাছাই করা গল্পের সঙ্কলন-গ্রন্থ ব্যতীত বাংলা-দেশে জগদীশ গুপ্তের রচনা দুর্লভ। 'বিনোদিনী' ও 'উদয়লেখা'র উনিশটি, 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং) গ্রন্থের তেরোটি, এবং 'পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প' (১৩৬৫), 'দেশ সুবর্ণ জয়ন্তী গল্প সংকলন' (১৯৮৪) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'গল্প সংগ্রহ' (১৯৭৯) গ্রন্থত্রয় থেকে একটি ক'রে গল্প নিয়ে সর্বমোট পঁয়ত্রিশটি গল্প-অবলম্বনে এই শ্রেণী বিন্যাসের প্রচেষ্টা।

৪৬ "হাড়" গল্পটি 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে সঙ্কলিত হয়েছে। সম্ভবতঃ ইতঃপূর্বে এটি গ্রন্থভুক্ত হয়নি। 'কালিকলম'

সম্পাদকের গল্পটি পছন্দ হয়েছিল—এ-তথ্য অনুসারে ঐ-পত্রিকাতেই গল্পটি প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল ব'লে আমাদের অনুমান। এর জন্য দ্র. জগদীশ গুপ্তের পত্রাবলী : ২৬, পূর্বোক্ত

৪৭ "দিবসের শেষে" : 'বিনোদিনী' ; 'জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭-৩৮

৪৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৮

৪৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯-৪০

৫০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪১

৫১ দ্র. পার্থসারথি চৌধুরী ; "শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী : জগদীশ গুপ্ত ইত্যাদি" ; 'সাপ্তাহিক দেশবার্তা', সম্পাদক : হিমাংশুশেখর ধর, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ১৩, ১৭ই এপ্রিল ১৯৮৫, সিলেট

৫২ "ভরা সুখে" তাঁর দ্বিতীয় গল্প, 'কালি-কলম' পত্রিকার ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত, পরবর্তীকালে 'বিনোদিনী' গল্পগ্রন্থে সঙ্কলিত।

৫৩ জগদীশ গুপ্তের পত্রাবলী : ২৬, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৯
"'হাড়' গল্পটির তরতরে ঝরঝরে ভাবটা আপনাদের ভাল লাগিয়াছে লিখিয়াছেন। আমার মনে হয়, উহার অনাড়ম্বরতাই উহার সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং উহাই তাহার সৌন্দর্য ; অর্থাৎ সেইটিই আপনার মনের চোখে আগে পড়িয়াছে, তারপরে সঙ্গে সঙ্গে রসতল্লাসী মন রসের সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু, অনেকেই তা 'জানতি' পারে না।"

৫৪ "হাড়" : 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০-২১

৫৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২

৫৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

৫৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬-২৭

৫৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯-৩০

৫৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

৬০ "পল্লী-শ্মশান" ; 'জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৭

৬১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৮

৬২ দ্র. "আরো দু'টি মৃত্যু" : 'আরো দু'টি মৃত্যু' ; হাসান হাফিজুর রহমান, প্র. প্র. এপ্রিল ১৯৭০, লেখক সংঘ : পূর্বাঞ্চল শাখা, ঢাকা, দ্র. পৃ. ১-১৩

৬৩ গল্পটি 'বিনোদিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত এবং ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'কালি-কলম'-এ প্রথম প্রকাশিত।

৬৪ "চন্দ্র-সূর্য যতোদিন" 'রূপের বাহিরে' (১৩৩৬) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত, দ্র. গ্রন্থপঞ্জি, 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫

৬৫ "মারে কেষ্ট রাখে কে!" গল্পগ্রন্থ 'উপলেখা'র (১৩৩৯) সঙ্কলিত, দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫

৬৬ "তরঙ্গ হইতে তরঙ্গে" 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' গল্পগ্রন্থভুক্ত, দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬

৬৭ "মারে কেষ্ট রাখে কে!" 'জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২১

৬৮ "চন্দ্র-সূর্য যতোদিন" ; 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৬৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৭০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

৭১ "তরঙ্গ হইতে তরঙ্গে", পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

৭২ "আদি কথার একটি" 'রূপের বাহিরে' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।

৭৩ "শঙ্কিতা অভয়া" 'মেঘাবৃত অশনি' (১৩৫৪) গল্পগ্রন্থে সঙ্কলিত। এই গল্পের সম্প্রসারণ 'নিষেধের পটভূমিকা' (১৩৫৯) শীর্ষক উপন্যাস। অভিন্ন-নামে উপন্যাসটির নাট্যরূপও দিয়েছিলেন জগদীশ গুপ্ত। তাঁর এই অ-গ্রন্থিত নাটক 'জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

৭৪ 'বেলোয়ারী টোপ' গল্পটি 'উত্তরা' (১৩৩২) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর 'দুলালের দোলা' (১৩৩৮) উপন্যাসের অংশবিশেষ পরিমার্জিত হয়ে উল্লেখিত গল্পটি সংগঠিত। 'জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী'র (১ম খণ্ড)

সম্পাদক নিরঞ্জন চক্রবর্তী 'দুলালের দোলা'র গ্রন্থপরিচয়-প্রসঙ্গে লিখেছেন : "এই উপন্যাসের একটি অংশ 'বেলোয়ারী টোপ' নামে গল্প হিসেবে 'উত্তরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে শ্রীসাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'শতবর্ষের শত গল্প' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। অংশ-বিশেষটির জন্য রচনাবলীর ২১৬ পৃষ্ঠার শেষ প্যারা হতে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য" (পৃ. ৬৪২)। ঐ-গল্পটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এবং ওয়াকিল আহমদ, সন্‌জীদা খাতুন, মাহমুদা খাতুন ও আহমদ কবির সম্পাদিত 'গল্প সংগ্রহ' (১৯৭৯) গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। নিরঞ্জন চক্রবর্তী "বেলোয়ারী টোপ" গল্প-প্রসঙ্গে ঐ-উপন্যাসের নির্বাচিত অংশের কথা উল্লেখ করেছেন; তিনি ঘটনার পুনর্বিন্যাস ও চরিত্রের রূপান্তরের প্রসঙ্গ উত্থাপনই করেননি। "বেলোয়ারী টোপ"-এর প্রারম্ভ-অংশ নতুন ক'রে লেখা, উপন্যাসে এ-অংশ নেই। এতদ্ব্যতীত, চরিত্র-রূপান্তরের প্রসঙ্গটিও গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসে ভারত যে 'পা'ট্‌কুড়ুনী মেয়ে'র সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে তার নাম স্বর্ণ—"সিম্মইর মত ভারতকে সে মামা ব'লে ডাকত"। কিন্তু "বেলোয়ারী টোপ" গল্পে ভারতের অবৈধ যৌনাচার পারিবারিক সম্পর্কের শৃঙ্খলাকে করেছে বিনষ্ট; ভারত তার আপন ভাগ্নী বোন-যোগেশ্বরীর কন্যা মৃণ্ময়ীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত।

৭৫ "কলঙ্কিত সম্পর্ক" গল্পটি 'শ্রীমতী' (১৩৩৭) গল্পগ্রন্থে "আহুতি" শিরোনামায় সঙ্কলিত। তবে 'জগদীশচন্দ্র গুপ্তের স্ব-নির্বাচিত গল্প' (১৯৫৯) গ্রন্থে ঐ-গল্পই "কলঙ্কিত সম্পর্ক" নামে প্রকাশিত হয়। 'স্ব-নির্বাচিত গল্পে'র অন্য গল্প "নিরুপম তীর্থ" এবং "কলঙ্কিত সম্পর্ক" গল্প-সমন্বয়ে তিনি রচনা করেন উপন্যাস 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৩৬৭)।

৭৬ "প্রাগৈতিহাসিক" : 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭); 'মানিক গ্রন্থাবলী' (তৃতীয় খণ্ড), তৃ. সং ১৯৮২, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা পৃ. ২৬২

৭৭ "আদি কথার একটি"; 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

৭৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

৭৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

৮০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৮১ "শঙ্কিতা অভয়া" ; 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

৮২ "কলঙ্কিত সম্পর্ক", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

৮৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭

৮৪ "ফাঁসি": 'প্রাগৈতিহাসিক'; 'মানিক গ্রন্থাবলী', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮-৯৯

৮৫ দ্র. 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং), পূর্বোক্ত, পৃ. পরিশিষ্ট—দশ

৮৬ "ফাঁসি", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯

৮৭ "অরূপের রাস" গল্পটি খুব সম্ভবতঃ ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার কোন এক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে 'রূপের বাহিরে' গ্রন্থে গল্পটি সঙ্কলন করা হয়।

৮৮ "আশা এবং আমি" 'মেঘাবৃত অশনি' (১৩৫৪) গ্রন্থের অন্তর্গত এবং সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প' (প্র. সং : ফাল্গুন ১৩৬৫, নতুন সাহিত্যভবন, কলিকাতা) গ্রন্থে সঙ্কলিত।

৮৯ 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' (১৩৪২) গ্রন্থের নাম-গল্প।

৯০ "অপহৃত আকাশ-কুসুম" গল্পও 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' গ্রন্থের অন্তর্গত।

৯১ "আশা এবং আমি"; 'পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫

৯২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬

৯৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯

৯৪ "অরূপের রাস" : 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

৯৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

৯৬ "শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী", পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৯৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৯৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৯৯ "অপহৃত আকাশ-কুসুম", 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

১০০ গল্পটি 'পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক' (?) গল্পগ্রন্থের নাম-গল্প।

১০১ "গুরুদয়ালের অপরাধ" গল্পটিও 'পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত।

১০২ "গুরুদয়ালের অপরাধ"; 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' (২য় সং), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

১০৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

১০৪ "সুলভ মৃত্যু" ('দেশ', বর্ষ ৩, সংখ্যা ২৩, বৈশাখ ১৩৪৩, ২৫ এপ্রিল ১৯৩৬) দ্র. 'দেশ সুবর্ণ জয়ন্তী গল্প সংকলন ১৯৩৩-৮৩'; সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ, দ্বি. সং : ডিসেম্বর ১৯৮৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃ. ১২-১৪

১০৫ "চার পয়সায় একআনা" গল্পখানি 'জগদীশচন্দ্র গুপ্তের স্ব-নির্বাচিত গল্প'-গ্রন্থের অন্তর্গত।

১০৬ "অনুদার অভিশাপে": 'বিনোদিনী'; 'জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৩-৬৮

১০৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৮

১০৮ গল্পটি 'উদয়লেখা' গ্রন্থের অন্তর্গত, দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৩-৩৯

১০৯ গল্পটি 'বিনোদিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত। এটি "চুন্ চুন্ সন মোরে মরী ঐ"-নামে 'কালি-কলম' পত্রিকার ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

১১০ জগদীশ গুপ্তের পত্রাবলী, পূর্বোক্ত

(ক) "—এইবার আপনার সঙ্গে আমার যথার্থ মতানৈক্য ঘটিল। ···প্রেম নয়, ত্যাগ নয়, শুধু, সুবর্ণের লোভের ভিতর দিয়া, সামান্য ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া, ব্যক্তি যতটা ফুটিতে পারে, তাহা ফুটিয়াছে। ···নির্বোধ গ্রামবাসীর নির্বুদ্ধিতাটাই অত্যন্ত করুণ এবং তাহার পরিণতিও করুণ।—দারিদ্র্যের একটা জীবনেতিহাস সুলিখিত হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস" (পত্র সংখ্যা : ১৪ ; পৃ. ৬১১)

(খ) "শিবপ্রিয়র উপরে কি ভাবে অদৃষ্টদত্ত আঘাত কাজ করিয়াছে তাহারই একটা চিত্র ফুটিলেই গল্পের গল্পত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ফুটিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সে যে Calibre-এর লোক তাহাতে তাহার দ্বারা ঐ কাজগুলি হওয়া স্বাভাবিক। সুরুতে শিবপ্রিয় স্বাধীন অর্থাৎ ঘটনার দাস নয়; তখন সে কয়েক মুহূর্তের জন্য সম্পূর্ণ চোখের সামনে, কিন্তু দুর্লোভের আবির্ভাবেই তার ব্যক্তিত্ব আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। শিবপ্রিয় সুচতুর নয়, কিন্তু কোমল। তাহার কোমলতার উপর ক্রমাগত আঘাতগুলি গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে, তাই সে বেদনায় পাগল হইয়া গেল। ··· —এই হিসাবে যে দৈবই অথবা নিয়তি তাহাকে নিরাশ্বাস শূন্যতার শেষ সীমায় আনিয়া একেবারে পরপারে পৌঁছিয়া দিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে না কি?" (পত্রসংখ্যা : ১৬, পৃ. ৬১২)

১১১ "তৃষিত আত্মা"-গল্প 'বিনোদিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত। গল্পটি সর্ব-প্রথম ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়।

১১২ "দৈবধন" এডগার এলান পো'র "দি মান্‌কিস্ প্য" অবলম্বনে লিখিত। গল্পটি 'উদয়লেখা' গ্রন্থে সঙ্কলিত।

১১৩ "ভরা সুখে—"; 'জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৯-৫০